নিকটে বলিতেছেন 'রে দুরাচার, তোরই চিত্তশুদ্ধি হেতু আমার পূজায় এ বিঘ্ন জন্মাইয়াছে। তুই এ পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয় লালসায় বদ্ধ হইয়া এই কুমারীর শোণিতে এত দিন আমার পূজা করিস নাই। অতএব এই কুমারী হইতেই তোর পূর্ব্ব পুণ্য ফল বিনষ্ট হইবে। আমি তোর নিকট আর কখন পূজা গ্রহণ করিব না।' কিন্তু অতঃপরে কাপালিকের প্রতি দয়া প্রকাশে বলিলেন, 'ভদ্র! ইহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিব। সেই কপালকুণ্ডলাকে আমার নিকট বলি দিবে। যত দিন না পার আমার পূজা করিও না।'

"স্বপ্ন শুনিয়া কপালকুণ্ডলা চমকিয়া উঠিলেন। চিত্তমধ্যে বিদ্যুচ্চঞ্চলা হইলেন।" নিয়তিচক্র আর এক পাক ঘুরিল। অদৃষ্ট জালে কপালকুণ্ডলাকে বেড়িয়া ধরিল। ভৈরবী ভক্তের জীবনের পরিণাম স্থির হইল; অদৃষ্ট-বাদীর অদৃষ্ট স্থির হইল।

লুৎফউন্নিসা এরূপ সময়ে কপালকুণ্ডলাকে কহিলেন "* * * তোমার প্রাণদান দিতেছি। তুমি আমার জন্য কিছু কর।" কপালকুণ্ডলা কহিলেন "কি করিব?"

"লু। আমারও প্রাণদান দাও—স্বামী ত্যাগ কর। কপালকুণ্ডলা অনেকক্ষণ কথা কহিলেন না। অনেক ক্ষণের পর কহিলেন, "স্বামী ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব?"

"লু। বিদেশে—বহু দূরে—তোমাকে অট্টালিকা দিব—ধন দিব—দাস দাসী দিব, রাণীর ন্যায় থাকিবে।

"কপালকুণ্ডলা আবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্র মানস লোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফউন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন? লুৎফউন্নিসাকে কহিলেন,

"তুমি আমার উপকার করিয়াছ কি না তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি না। অট্টালিকা, ধন, সম্পত্তি, দাস দাসীর প্রয়োজন নাই। আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর কোন সম্বাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।"

পাঠক! বিস্মিত হইলে? যদি কপালকুণ্ডলাকে ভাল করিয়া চিনিতে পারিয়া থাক, বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। ইহাই কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি, ইহাই তাহার স্বাভাবিক উত্তর। সময়োচিত ও বটেই। এতৎসম্বন্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"লুৎফউন্নিসার সম্বাদে কপালকুণ্ডলার একেবারে চিত্তভাব পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন। আত্মবিসর্জ্জন কি জন্য? লুৎফউন্নিসার জন্য? তাহা নহে।

"কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান, তান্ত্রিক যেরূপ কালিকাপ্রসাদাকাঙ্ক্ষায় পরপ্রাণ সংহারে সংকোচশূন্য, কপালকুণ্ডলা সেইরূপ আকাঙ্ক্ষায় আত্মবিসর্জ্জনে। কপালকুণ্ডলা যে কাপালিকের ন্যায় অনন্যচিত্ত হইয়া শক্তিপ্রসাদ-প্রার্থিনী হইয়াছিলেন, তাহা নহে; তথাপি অহর্নিশ শক্তি ভক্তি দর্শন ও সাধনে তাঁহার মনে কালিকানুকম্পায় বিশিষ্টপ্রত্যয়

জন্মিয়াছিল। ভৈরবী যে সৃষ্টি-শাসন কর্ত্রী, মুক্তি-দাত্রী ইহা বিশেষ মতে প্রতীত হইয়াছিল। কালিকার পূজাভূমি যে নরশোণিতে প্লাবিত হয়, ইহা তাঁহার পরদুঃখে দুঃখিত হৃদয়ে সহিত না, কিন্তু আর কোন কার্য্যে ভক্তি প্রদর্শনের ত্রুটি ছিল না। এখন সেই জগৎ শাসন-কর্ত্রী, সুখ-দুঃখ-বিধায়িনী, কৈবল্য-দায়িনী ভৈরবী স্বপ্নে তাঁহার জীবন সমর্পণ আদেশ করিয়াছেন। কেনই বা কপালকুণ্ডলা সে আদেশ পালন না করিবেন?

"তুমি আমি প্রাণত্যাগ করিতে চাহি না। রাগ করিয়া যাহা বলি, এ সংসার সুখময়। সুখের প্রত্যাশাতেই বর্ত্তুলবৎ সংসার মধ্যে ফিরিতেছি—দুঃখের প্রত্যাশায় নহে। কদাচিৎ যদি আত্ম-কর্ম্মদোষে সেই প্রত্যাশা সফলীকৃত না হয়, তবেই দুঃখ বলিয়া উচ্চ কলরব আরম্ভ করি। তাহা হইলেই দুঃখ নিয়ম নহে, সিদ্ধ হইল। নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। তোমার আমার সর্ব্বত্র সুখ। সেই সুখে আমরা সংসার মধ্যে বদ্ধমূল; ছাড়িতে চাহি না। কিন্তু এ সংসার বন্ধনে প্রণয় প্রধান রজ্জু। কপালকুণ্ডলার সে বন্ধন ছিল না—কোন বন্ধন ছিল না। তবে কপালকুণ্ডলাকে কে রাখে?

"যাহার বন্ধন নাই, তাহারই অপ্রতিহত বেগ। গিরিশিখর হইতে নির্ঝরিণী নামিলে কে তাহার গতি রোধ করে? একবার বায়ু তাড়িত হইলে কে তাহার সঞ্চারণ নিবারণ করে? কপালকুণ্ডলার চিত্ত চঞ্চল হইলে কে তাহার স্থিতি স্থাপন করিবে? নবীন করি-শাবক মাতিলে কে তাহাকে শান্ত করিবে?"

কপালকুণ্ডলার চরিত্র ব্যাখ্যাত হইল। নবকুমারের প্রতি যে তাহার একান্ত স্নেহ ছিল না, গ্রন্থকার তাহা কপালকুণ্ডলার কার্য্য দ্বারা বলাইলেন, নিজেও বলিলেন। আমরা ইহার কারণ পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করিয়াছি। একজনের প্রতি স্নেহ কেন্দ্রীভূত করিতে কপালকুণ্ডলা পারিত না; তাহার হৃদয় যে অধীনতাটুকু সহ্য করিতে শিখে নাই। কপালকুণ্ডলা প্রকৃতি-পালিতা কানন-বাসিনী সংস্কার-জ্ঞান-বিরহিতা অপূর্ব্বা রমণী।

"কপালকুণ্ডলা আপন চিত্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেনই বা এ শরীর জগদীশ্বরীর চরণে সমর্পণ না করিব? পঞ্চভূত লইয়া কি হইবে?' প্রশ্ন করিতেছিলেন অথচ কোন নিশ্চিত উত্তর দিতে পারিতেছিলেন না।" সংসারের অন্য বন্ধন না থাকিলেও পঞ্চ ভূতের একটা বন্ধন আছে।

"কপালকুণ্ডলা অধোবদনে চলিতে লাগিলেন। যখন মনুষ্য হৃদয় কোন উৎকট ভাবে আচ্ছন্ন হয়, চিন্তার একাগ্রতায় বাহ্য সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, তখন অনৈসর্গিক পদার্থ প্রত্যক্ষীভূত বলিয়া বোধ হয়। কপালকুণ্ডলার সেই অবস্থা হইয়াছিল। যেন ঊর্দ্ধ হইতে তাঁহার কর্ণকুহরে এই শব্দ প্রবেশ করিল 'বৎসে, আমি পথ দেখাইতেছি।' কপালকুণ্ডলা চকিতের ন্যায় ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন, যেন আকাশমণ্ডলে নব-নীরদ-নিন্দিত মূর্ত্তি; গলবিলম্বিত-নরকপাল-মালা হইতে শোণিত স্রুতি হইতেছে; কটিমণ্ডল বেড়িয়া নর-কর-রাজি দুলিতেছে—

বাম করে নরকপাল—অঙ্গে রুধির ধারা, ললাটে বিস্ফোরজ্জ্বল-জ্বালা-বিভাসিত, লোচন প্রান্তে বালশশী সুশোভিত! যেন ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন।

"কপালকুণ্ডলা ঊর্দ্ধমুখী হইয়া চলিলেন। সেই নব-কাদম্বিনী-নিভরূপ আকাশ মার্গে তাঁহার আগে আগে চলিল। কখন নৃকপাল-মালিনীর অবয়ব মেঘে লুকায়িত হয়, কখন নয়ন পথে স্পষ্ট বিকশিত হয়। কপালকুণ্ডলা তাঁহার প্রতি চাহিয়া চলিলেন।"

অদৃষ্ট নেমীর আবর্ত্তন ফুরাইল। কপালকুণ্ডলায় সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, মানুষের যাহা কিছু তাহা এখন তাহার নাই। তিনি এখন যোগিনী শ্রেষ্ঠ। মনের যখন এরূপ অবস্থা, নবকুমার ভীমনাদে ডাকিলেন, 'কপালকুণ্ডলে!'

"কপালকুণ্ডলা শুনিয়া চমকিতা হইলেন। বুঝি মনে ভাবিলেন ভৈরবী তাঁহাকে ডাকিতেছেন। ইদানীন্তন কেহ তাঁহাকে কপালকুণ্ডলা বলিয়া ডাকিত না। তিনি মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইলেন। নবকুমার ও কাপালিক তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। কপালকুণ্ডলা প্রথমে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিলেন না—কহিলেন,—

'তোমরা কে? যমদূত?'

পরক্ষণেই চিনিতে পারিয়া কহিলেন,—

'না! না! পিতঃ তুমি কি আমায় বলি দিতে আসিয়াছ?' এই কথা গুলির সহিত তাঁহার বর্ত্তমান মনোভাবের ও তাঁহার প্রকৃত স্বভাবের কিরূপ সঙ্গ হইল দেখিতে, ইহাকেই নাটকর বলে। যেরূপ কথা গুলির মনোভাবের সহিত মিল আছে, মনোভাবের সহিত আবার ঘটনাবলির সেইরূপ সঙ্গ আছে। কপালকুণ্ডলা তান-মান-লয় বিশুদ্ধ একটি মনোহর সঙ্গীতই বটে।

"নবকুমার কপালকুণ্ডলার হস্ত দৃঢ় মুষ্টিতে ধারণ করিলেন। কাপালিক করুণার্দ্র মধুময় স্বরে কহিলেন, 'বৎসে! আমাদিগের সঙ্গে আইস।' এই বলিয়া শ্মশানাভিমুখে পথ দেখাইয়া চলিলেন।

"কপালকুণ্ডলা আকাশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। যথায় গগনবিহারিণী ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন, সেই দিকে চাহিলেন, দেখিলেন, রণরঙ্গিণী ঘন ঘন হাসিতেছে, এক দীর্ঘ ত্রিশূল করে ধরিয়া কাপালিক-গত-পথ প্রতি সঙ্কেত করিতেছে। কপালকুণ্ডলা অদৃষ্ট বিমূঢ়ার ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের অনুসরণ করিলেন। নবকুমার পূর্ব্ববৎ দৃঢ় মুষ্টিতে তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া চলিলেন।"

কপালকুণ্ডলা এইরূপে প্রেতভূমে আনীত হইল। কাপালিক যথারীতি ভৈরবীর পূজা সমাধানান্তে কপালকুণ্ডলাকে স্নান করাইয়া আনিতে বলিলেন।

নবকুমার কপালকুণ্ডলার হস্ত ধারণ করিয়া শ্মশানভূমির উপর দিয়া স্নান করাইতে লইয়া চলিলেন। তাঁহাদিগের চরণে অস্থি ফুটিতে লাগিল। নবকুমারের পদের আঘাতে একখণ্ড জলপূর্ণ শ্মশানকলস ভগ্ন হইয়া গেল। তাহার নিকটেই শব পড়িয়াছিল, হতভাগার কেহ সৎকারও করে

নাই। দুই জনেরই তাহাতে পদ স্পর্শ হইল। কপালকুণ্ডলা তাহাকে মাড়িয়া গেলেন * * * নবকুমার তাহাকে চরণে দলিত করিয়া গেলেন। চতুর্দ্দিক বেড়িয়া শবমাংসভুক্ পশু সকল ফিরিতেছিল; মনুষ্য দুই জনের আগমনে উচ্চকণ্ঠে রব করিতে লাগিল, কেহ আক্রমণ করিতে আসিল; কেহবা পদ শব্দ করিয়া চলিয়া গেল। কপালকুণ্ডলা দেখিলেন নবকুমারের হস্ত কাঁপিতেছে; কপালকুণ্ডলা স্বয়ং নির্ভীক নিষ্কম্প।"

"কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিলেন 'স্বামিন্! ভয় পাইতেছ?' এইখানে আমরা নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। দুই একটি বাক্যের কথা ছাড়া কপালকুণ্ডলাকে আমরা নবকুমারের সহিত বিবাহিতাবস্থায় কথা কহিতে শুনি নাই। প্রলোভনটি ত্যাগ করায় কবির মনের উপরে আধিপত্য যথেষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। তুমি আমি ইহা নিশ্চয়ই পারিতাম না। এমন নায়ক নায়িকা পাইয়া দুইটা প্রেমালাপ না করাইয়া কি আমরা থাকিতে পারিতাম? কবি এ পুস্তকখানি লিখিবার সময়ে তরুণ বয়স্ক হইলেও, মনের উপরে তাঁহার ইচ্ছামত ক্ষমতা প্রকাশে তাঁহাকে সম্যক্ অভ্যস্ত দেখিতে পাই। এইরূপ ক্ষমতা লেখকের পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যক। এইরূপ ক্ষমতা যথেষ্ট থাকিলেও, কপালকুণ্ডলার ন্যায় চরিত্র লইয়া সর্ব্বদা খেলা করা তাহাও সাধারণের নহে। কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমারের প্রেমালাপ সংঘটন করাইলে, কবি তাঁহার চরিত্রের সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারিতেন না। কপালকুণ্ডলা সামাজিক প্রণয়িনী নহে।

নবকুমার গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন, 'ভয়ে, মৃণ্ময়ি? তাহা নহে।' কপালকুণ্ডলা সমস্ত বুঝিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে কাঁপিতেছ কেন?' গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "এই প্রশ্ন কপালকুণ্ডলা যে স্বরে করিলেন, তাহা কেবল রমণীকণ্ঠেই সম্ভবে। যখন রমণী পরদুঃখে গলিয়া যায়, কেবল রমণীকণ্ঠে সে স্বর সম্ভবে। কে জানিত যে আসন্নকালে শ্মশানে আসিয়া কপালকুণ্ডলার কণ্ঠ হইতে এ স্বর নির্গত হইবে?"

গ্রন্থকার ইঙ্গিতে বুঝাইয়া গেলেন যে, কপালকুণ্ডলা এখন নবকুমারের কষ্ট অনুভব করিয়া আপনার কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এখন কপালকুণ্ডলা নবকুমারের দুঃখে দুঃখিতা। বিপন্নের প্রতি দয়া দয়ার্দ্র চিত্তের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। ইহার কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই আমরা কপালকুণ্ডলাকে কি ভাবে দেখিয়াছিলাম? কোন প্রলয় ঝটিকা পরে প্রকৃতি যেমন তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করে, কপালকুণ্ডলাও তাহাই করিয়াছিলেন। ভয়ে ভক্তিতে তাঁহার হৃদয় আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল—বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তিনি কেবল সেই ভয়ভক্তির নিরতিশয়তার পরিণাম-ফল ভোগ করিতেছিলেন। কিন্তু নবকুমারের দুঃখ দেখিয়া আবার তাঁহা স্বভাবস্থ হইল। ইহার কিছু পূর্ব্বেও পতিত শবদেহ বেষ্টনে তাহার কিছু স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। যেরূপ অগ্নি-উৎপাদক প্রস্তর বিশেষ স্বাভাবিক অবস্থায় প্রস্তরবৎ থাকিয়াও দ্রব্যবিশেষের ঈষৎ আঘাতেও অগ্নি উদ্গীরণ করে, কপালকুণ্ডলার মনেও

ঠিক সেইরূপ, শ্মশান দেখিয়া, অসংস্কৃত শবদেহ দেখিয়া পরিবেশের নবকুমারের ভ্রম-মূলক দুঃখরাশি দেখিয়া দয়াগ্নি বিভাসিত হইল। নবকুমারের প্রতি কপালকুণ্ডলার স্নেহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল; বুঝি কপাল-কুণ্ডলার পরিণাম ভাবিয়া তাহা আরও তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল। চিরদিন যাঁহার সহিত একত্র বাস করিয়া আসিয়াছি, তাহাকে একেবারে তুচ্ছ করা যায় না। কপালকুণ্ডলা ত নবকুমারের পত্নী। অন্য পত্নীর ন্যায় তাহার স্নেহ নাই বা থাকিল, এরূপ অবস্থায় কি সে পাষাণবৎ স্থির থাকিতে পারে?

নবকুমার কহিলেন, 'ভয়ে নহে। কাঁদিতে পারিতেছি না, এই ক্রোধে কাঁপিতেছি।'

কপালকুণ্ডলা জিজ্ঞাসিলেন, 'কাঁদিবে কেন?'

এই স্বরের সহিত স্বর বাঁধিয়া গ্রন্থকার আমাদিগকে বলিলেন 'আবার সেই বধ!'

নবকুমার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। রোদন করিতে করিতে মৃন্ময়ীর পদতলে আছাড়িয়া পড়িলেন। বলিলেন, 'মৃন্ময়ী!—কপালকুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি—একবার বল যে তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল, আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই।'

"কপালকুণ্ডলা হাতে ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন—মৃদুস্বরে কহিলেন 'তুমিত জিজ্ঞাসা কর নাই।' দম্পতির হৃদয়ের ন্যায় তাঁহাদিগের সম্মুখস্থ নদীতে এখন জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইয়াছিল। কপালকুণ্ডলা একটি জমির উপর দাঁড়াইয়াছিলেন। কপালকুণ্ডলা বলিলেন, 'তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই।'

মৃত্যুকালীন কুন্দের সেই ঈষৎ তিরস্কার-ব্যঞ্জক মৃদু, মধুর স্নেহপরিপূর্ণ কথা শুনিয়াছি, দেসদিমোনার সেই আসন্নকালীন প্রার্থনাবাক্য শুনিয়াছি, কিন্তু এত কোমল, এত মধুর, এত স্নেহপূর্ণ, এত ঝঙ্কারাত্মক—কথা ত কখনও শুনি নাই!

"নবকুমার শিশুর ন্যায় কহিলেন 'চৈতন্য হারাইয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিব—বল—মৃন্ময়ী! বল—বল—বল—আমায় রাখ!—গৃহে চল।' কপালকুণ্ডলা কহিলেন 'যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিব। আজি যাহাকে দেখিয়াছ—সে পদ্মাবতী আমি অবিশ্বাসিনী নহি। এ কথা স্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আর আমি গৃহে যাব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। স্বামিন্! তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।'

'না—মৃন্ময়ী!—না'—এইরূপ উচ্চরব করিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহু প্রসারণ করিলেন। কপালকুণ্ডলাকে আর পাইলেন না। চৈত্র-বায়ু-তাড়িত এক বিষম নদীতরঙ্গ আসিয়া তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটাধোভাগে প্রহত হইল, অমনি তট-মৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলা সহিত ঘোর রবে নদীপ্রবাহ মধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল।"

নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে তুলিবার জন্য জলে ঝাঁপ দিলেন, কিন্তু তাহাকে পাইলেন না। তিনিও উঠিলেন না।

"সেই অনন্ত গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যে বসন্ত বায়ু বিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে

হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমারে অঙ্কিত হইল।

গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইল। যেন আমাদিগের একটি স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, যেন সঙ্গীতের বিরতি-সূচক স্বর ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আকাশের সহিত লীন হইয়া গেল। যেন প্রিয়জনের শবভস্মকারী শ্মশানাগ্নি একেবারে নির্ব্বাপিত হইল।

প্রকৃতিদেবী আপন ক্রোড়ে প্রিয়তমা দুহিতাকে পুনর্গ্রহণ করিলেন। সেই উদ্বেলিত নদীগর্ভ মধ্যে কপালকুণ্ডলা স্থান পাইল। প্রকৃতিপ্রিয় কবি প্রকৃতির স্নেহময়ী দুহিতাটিকে প্রকৃতিময়ী করিয়া এই জগৎ হইতে লুকাইয়া রাখিলেন। মনোপ্রকৃতিতে কিন্তু কপালকুণ্ডলা সেইরূপ অবেণী সম্বদ্ধ কেশভার লইয়া ছুটাছুটি করিতে রহিল।

কপালকুণ্ডলা বিহঙ্গিনী। কাপালিকের ভয়ে পাখীটি নবকুমারের কোলে পড়িয়া আশ্রিত হইয়াছিল। নবকুমার তাহাকে যত্ন করিয়া লইয়া গিয়া সংসার-পিঞ্জরে প্রণয়-শৃঙ্খলে বাঁধিয়া রাখিয়া দিলেন। পাখীটিকে পোষ মানাইবার জন্য কতই চেষ্টা করিয়াছিলেন—অভিমান ত্যাগ করিয়া, ক্রোধ ত্যাগ করিয়া, পুরুষের ক্ষমতা ছাড়িয়া দিয়া, কোমল হস্তে কতই না ইহাকে আদর করিয়াছিলেন। [illegible] পাখী [illegible] কিছুতেই পোষ মানিল না। একদিনের [illegible] তরেও নবকুমারের মনোমত [illegible] বলিল না। এত যত্ন পাকিতে [illegible] একদিনও সে যত্নের জন্য যত্নকারী [illegible] মিষ্ট বাক্যে আপ্যায়িত করিত না। [illegible] যাইতে ত জানিত। [illegible] অমন সুস্থ বক্ত [illegible] কোমল প্রকৃতি না থাকিলে কত সুন্দরই না গাহিতে পারিত। কিন্তু কিছুতেই সে পোষা পাখীর মত নবকুমারের মনের গীত গাহিল না। অবশেষে একদিন অবসর পাইয়া নবকুমারকেই চোরী সাব্যস্ত করিয়া তাহারই সুদৃঢ় পিঞ্জর ভাঙ্গিয়া চলিয়া গেল। পিঞ্জর ভাঙ্গিল বটে, কিন্তু শৃঙ্খল ছিঁড়িতে পারিল না; আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে নবকুমারও আকৃষ্ট হইলেন। সব ফুরাইল।

কপালকুণ্ডলা কবির একটী অতি অপূর্ব্ব সৃষ্টি। এই সৃষ্টি মাধুর্য্য অনুভবের জিনিষ, বর্ণনার জিনিস নহে। কারণ, কপালকুণ্ডলা ভাবময়ী, অথবা তাহা হইলেও একরূপ বুঝান যাইত—কপালকুণ্ডলা ছায়াময়ী। সত্য বটে, কবি ইহাকে ভাবময়ী করিয়াই আমাদিগের সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু কোন ভাষাই কপালকুণ্ডলার পূর্ণবিষয় প্রদর্শন করিতে সমর্থ নহে। কলাবিৎ কণ্ঠ সঙ্গীতকালে দীর্ঘ স্বরের অপূর্ণতা ও স্বর-বিচ্ছেদ কোন এক বাদিত্রযন্ত্রধ্বনির সাহায্যে পূরণ করিয়া থাকেন, আমাদিগের কবিবরও সেইরূপ তাঁহার এ মনোহর সঙ্গীতটি ভাষায় গঠিত করিয়া, ও ইহার পূর্ণতা ও বিচ্ছেদ পাঠকবর্গের মানসযন্ত্র ধ্বনিত করিয়া পূরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ যন্ত্র যাঁহার ধ্বনিত হইবার জন্য শিক্ষা প্রাপ্ত হয় নাই, যাঁহার এ যন্ত্র সঙ্গীতের সুরের সঙ্গে মিশিতে অসমর্থ, কপালকুণ্ডলা তাঁহার নিকট [illegible] অপূর্ণ। ভ্রমর, মৃণ্ময়ী, তাঁহার জন্য হইতে পারে, কিন্তু কপালকুণ্ডলা নিশ্চয়ই তাঁহার জন্য নহে। কপালকুণ্ডলা চির

পদ—চিত্রেল ছায়া প্রতিচিত্র-গ্রহণ-কারীরা যেরূপ চিকিত্তর পদার্থের ছায়া-মাত্র গ্রহণ করিয়া পরিশেষে তাহাই বহু-বিধ বর্ণে প্রতিভাসিত করিয়া, ঠিক সেই পদার্থের অনুরূপ রচনা করে, পাঠক-বর্গকেও সেইরূপ এই ছায়া লইয়া মনো-মধ্যে কপালকুণ্ডলাকে অঙ্কিত করিয়া লইতে হইবে। ছায়াটি একটী যন্ত্র সাহায্যে উঠিয়াছে; সে বাহাদুরী যন্ত্রের কিম্বা শিল্পি-গণের বাহাদুরী পাঠকবর্গের। তাই চিত্রনিপুণ পাঠকবর্গের নিকটে পূর্ণ মূর্ত্তি অপেক্ষা—এই ছায়ারই আদর অধিক।

পাঠক, কখনও কোনও চিত্রগৃহে বঙ্গ-শুভেচ্ছু (রঙ্গের খাবড়ার) ছবি দেখিয়াছ? এখানে এক খাবড়া রঙ, ওখানে এক খাবড়া রঙ, বহু বর্ণ-বিন্যস্ত অথচ অসম্বিন্যস্তের ন্যায় পরিদৃশ্যমান রঙের খাবড়া ছবি কখন দেখিয়াছ? কপাল-কুণ্ডলা সেইরূপ চিত্র। ইহাতে কোনও সূক্ষ্ম কারুকার্য্য নাই—অথচ চিত্রটী বড়ই সুন্দর। যে চিত্রে সূক্ষ্ম কারুকার্য্য থাকে, তাহা হঠাৎ কেহ না বুঝিলে, বুঝাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু এরূপ চিত্র না বুঝিলে, বুঝান দুষ্কর। ইহার বিশ্লেষণ হয় না—ইহার বিশ্লেষণে ইহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। তবে বুঝান যায়—উহার সেই এক একটি বর্ণ গুচ্ছের (রঙের খাবড়ার) সৌন্দর্য্য। তাহাই আমরা চেষ্টা করিতে পারি—কিন্তু সেই সমগ্র চিত্রের সৌন্দর্য্য অবর্ণনীয়।

ঐ দেখ সেই রকম এক খাবড়া পাশু বর্ণে ঐ কি চিত্রিত হইয়াছে;—বিস্তৃত মরুভূমি—মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড তেজ ধারণ করিয়া অনলশিখার ন্যায় জ্বলিতেছে। চতুর্দ্দিকে বৃক্ষ নাই, লতা নাই, শ্যামল নাই; তথায় পশু চলে না, পাখী ডাকে না, সমীরণও যেন বহে না। এহেন ভীষণ মরুভূমির মধ্যদেশে ঐ যে একটী পথিক ধীরে ধীরে পদক্ষেপ করি-তেছে। পথিক পথহারা—তাঁহার বদন-মণ্ডলে বিষম আশঙ্কার চিহ্ন। নয়নযুগল ভীতিব্যঞ্জক, সমুদ্রে পতিতের ন্যায় নিরা-শায় হাবুডুবু করিতেছে। তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া গিয়াছে, ক্ষুধায় জঠর কুক্ষীভূত হইয়া গিয়াছে। পথিক বিষম বিপদগ্রস্ত। আত্মহারা হইয়া পথিক কি ভাবিতেছেন —সহসা এ কি!—পথিকের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া ধপ্ করিয়া এ কি জ্বলিয়া উঠিল। এ যে প্রদীপ্ত অনলশিখা—আগুনের মধ্যে আগুন। পথিক জীবনে নিরাশ হইলেন—হা ভগবান্ বলিয়া সেই ভীষণ মরুভূমিতে, সেই ভীষণ অনলরাশি-মধ্যে নিশ্চেষ্ট হইয়া আত্মসমর্পণ করি-লেন। এমন সময়ে সহসা তাঁহার চতু-র্দ্দিকে আবার এ কি এ উত্থিত হইল। সেই ভীষণ মরুভূমি ভেদ করিয়া আবার এ কি এ তাঁহাকে বেষ্টন করিল। এ যে সলিলের উৎস। শুভ্র, নির্ম্মল, সুশীতল, বারিপুঞ্জ। আহা মরি মরি কি সুন্দর চিত্র রে!—সেই ভীষণ মরু মধ্যে, সেই ভীষণ অনলরাশি মধ্যে আ[illegible] কবি বলি এ কি এ সুন্দর সৃষ্টি নির্ঝর[illegible] কল শব্দ ময়, বায়ু রবে কি ঐ মধুর [illegible]। স্বজন-পরিত্যক্ত বিজন প্রদেশে [illegible] পা-লিক কর্ত্তৃক বলাৎ আনীত [illegible] নিরীহ নবকুমারের পার্শ্বে, ঐ [illegible] সমো-

ইন্দ্রনগর অরণ্য [illegible] সেই মহাত্মাদের ক্রীড়াভূমি ভীষণ কুরুক্ষেত্রে শরশয্যা-শায়িত ভীষ্মমুখে অর্জ্জুনশরপ্রোথিত ভূমি ধরিত্রীভেদী সলিলধারাও এত অমৃতময়ী নহে।

ঐ দেখ আর এক স্থানে আর এক ধাবড়া রঙ্গে ঐ কি লিখিত হইয়াছে,—মাতৃক্রোড়ে একটী যুবতী বালিকা। মায়ের আর সন্তান নাই, মায়ের পুত্রও ঐ, কন্যাও ঐ, তাই কন্যাটি যুবতী হইলেও বালিকার ন্যায় এখনও লালিত। এখনও সে বনে বনে ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, এখনও সে মায়ের কাছে বালিকার ন্যায় আবদার করে। গাত্রে আভরণ নাই, দরিদ্র মাতা আভরণ কোথায় পাইবে? অথবা সে পাগলা মেয়েকে আভরণ পরান যাইতই না। কেশরাশি সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। নয়ন বালহৃদয় প্রতিভাসিত তেমতি সরল, তেমতি স্নেহপূর্ণ। আবার যুবতীর ন্যায় তাহাতে গাম্ভীর্য্যও প্রকটিত রহিয়াছে। বালিকার মাধুর্য্য ও যুবতীর গাম্ভীর্য্য মধুরভাবে মিশ্রিত রহিয়াছে। বালিকাটি মাতৃক্রোড়ে বসিয়া মায়েরমুখপানে চাহিয়া আছে, এমন সময় হঠাৎ কে আসিয়া তাহাকে মাতৃক্রোড়চ্যুত করিয়া লইয়া গেল। বালিকা কাঁদিল না, অথবা কাঁদিল, কিন্তু আর্ত্তনাদ করিল না। সে কিছুই বুঝিল না—অথবা বুঝিল, কিন্তু নিরুপায় ভাবিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ ব্যতীত আর কিছুই করিল না। ঐ দেখ, ঐ মাতৃক্রোড়চ্যুতা যুবতী বালিকা আজি বিবাহিতা হইয়াছে। আজ সংসার-রূপিণী বিমাতা তাঁহাকে কত আদর করিতেছে, মনপ্রাণ খুলিয়া [illegible] সেবা [illegible] মাতৃস্নেহ নাই বলিয়া, মাতৃক্রোড়চ্যুত বালিকাকে হয়তো তাহারা কত আদর করিতেছে। [illegible] দিন [illegible] করিতেছে, ননদিনী আসিয়া আদর যত্ন করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই যেন তাহার মন উঠিতেছে না। [illegible] যে মায়ের কোলে ছিল, এখানে [illegible] এ বিমাতা! মাতৃহারা [illegible] মা মা বলিয়া রোদন করে, তবে [illegible] হাহার নিকটে যতই [illegible] হয় না, সে তাহাকে [illegible] করিবে না, বরং [illegible] যে আদর [illegible] বুকে করিত, সে সময়ে সে তাহা দূরে নিক্ষেপ করিত, যুবতী আজ ঠিক তাহাই করিতেছে। [illegible] কাঁদিতে যেন তাহার চক্ষু দুইটী ফুলিয়া পড়িয়াছে, মুখখানি যেন রাহুগ্রস্ত বিমলিন চন্দ্রমার ন্যায় শোভা পাইতেছে। দেখ দেখি, চিত্রকরের কি অদ্ভুত শিল্প-চাতুর্য্য! সে মুখখানি কেমন ফুটিয়াছে—সে মনোভাবটি কেমন খুলিয়াছে। প্রকৃতি হইতে [illegible] বালিকা কপালকুণ্ডলাকে সংসারের ক্রোড়ে আজ কেমন দেখিতেছ? আর কখন কোন [illegible] বিহঙ্গিনীকে খাঁচায় পুরিয়া রাখিলে [illegible] হইবে? কোন বন্য ব্রততীকে বন হইতে তুলিয়া টবে বসাইতে ইচ্ছা যাইবে?

এই দেখ আর এক ধাবড়া রঙে এ কি লিখিত হইয়াছে। প্রকৃতির সহিত সমাজের সংগ্রামের পরিণাম। কাব্যে, ইতিহাসে, দর্শনে, [illegible] যে সকল জাতির দুঃখের কথা পড়িয়াছ, [illegible] সকল শ্মশান-

যেমন দেখিয়াছ, যে সকল লোক সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়াছ, সেই একত্রিত করিয়া ভাবুকী একবার ঐ দিকে চাহিয়া দেখ দেখি।—ঐ শ্মশানভূমির প্রান্তভাগে, উচ্ছ্বাসময়ী ভাগীরথীর তটোদেশের ঐ ভগ্ন মূর্ত্তি নিরীক্ষণ কর দেখি—ঐ প্রান্তে আর ঐ সমাজের দিকে তাকাও দেখি—এরূপ কাহাকে কখন কি দেখিয়াছ? এরূপ হৃদয়ভেদী গাম্ভীর্য্যময় মধুরমূর্ত্তি আর কখনও কি দেখিয়াছ? ঐ দেখ ঐ সমাজ-জিত প্রেমিক নবকুমার—ঐ দেখ ঐ স্বভাব-প্রেমিকা কপালকুণ্ডলা। উভয়েরই নয়নোচ্ছ্বাস দেখ—উভয়েরই আত্মবিসর্জ্জন দেখ। আরও দেখিতে চাও? [illegible] হইতে তোমাদিগের নিকটে আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম। কপালকুণ্ডলা যে আমাদিগের প্রিয়তমা দুহিতা—তাহাকে শ্মশানস্থ দেখাইলাম—তাহার ভস্মাবশেষ দেখাইতে পারিব না।

কিন্তু এ সকল ব্যষ্টির সৌন্দর্য্য—সমষ্টির সৌন্দর্য্য বুঝান যায় না। এ ব্যষ্টির সৌন্দর্য্য নিকটে আসিয়া দেখা যায়—কিন্তু সমষ্টির সৌন্দর্য্য নিকটে আসিয়া দেখা যায় না। তাহা দেখিতে হইলে নবকুমারের মত অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে গম্ভীরনাদী বারিধিকূলে উচ্ছ্বসিত মনোভাব লইয়া দেখিতে হইবে। সংসারীর কাছে অমন প্রকৃতিতনয়া কপালকুণ্ডলা ভিন্ন ত উজ্জ্বল হইতে পারে না—ছায়াময়ী ভাবেই তাহাকে দেখিতে হইবে—কল্পনার স্বপ্নে তাহাকে দেখিতে হইবে। তাই বলিতে-ছিলাম, কপালকুণ্ডলা স্বপ্নদেবের জিনিস, কল্পনার জিনিস যেন। স্বভাব বর্ণনা করা যায়, কিন্তু ভাবের ছায়া বর্ণনা করা যায় না। কল্পনা বর্ণনা করা যায় কিন্তু কল্পনার স্বপ্ন বর্ণনা করা যায় না।

কপালকুণ্ডলা আদর্শ রমণী নহে, কিন্তু তবু চিত্ত বিমোহিনী। ইহার কতক কারণ, এক প্রকার বলা হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা বিজন মরুভূমিতে বিমল সলিলধারা, কপালকুণ্ডলা বিমাতৃক্রোড়ে আদরপালিতা মাতৃহারা শিশু, কপালকুণ্ডলা প্রিয়তমা তনয়ার বিষণ্ণ মুখচ্ছবি। কপালকুণ্ডলা আমাদিগের নিকটে অতীতের স্মৃতি—রোগীর তন্দ্রা, নিদাঘের মলয় মারুত। এই স্বার্থময় কপটতা জড়িত সংসারে থাকিয়া থাকিয়া আমরা একান্ত ক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছি—সরলতাময়ী পরমশ্রী কপালকুণ্ডলা তাই আমাদিগের এত ভাল লাগে। কপালকুণ্ডলা যে সম্পূর্ণ সংসার ছাড়া—তাই সংসারী আমরা, কপালকুণ্ডলা আমাদিগের নিকট বড় অপূর্ব্ব, বড় মধুর। অমন ছবি ত আর কোথাও নাই। এমন সংসার-ছাড়া জীব আর কোথাও ত দেখিতে পাই না। কপালকুণ্ডলাকে যে আমরা এক সময়েও সংসারী বলিয়া, আপনার বলিয়া, বোধ করিতে পারিলাম না। আর এ প্রকার—যত ছবি দেখিয়াছি, সকলগুলিই এক সময়ে না এক সময়ে আমরা আপনার বলিয়া বোধ করিতে পারিয়াছি। রমণীর চিত্তে স্বামী প্রেমই জীবন স্বরূপ; এই জীবনটি আমরা প্রায় সকল ছবিতেই এই সংসারের বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। অন্য সময়ে সংসার ছাড়া ভাবিতে পারিলেও, এ সময়ে যেন

তাহারা সম্পূর্ণ আমাদিগের বোধ হইয়াছে। সম্পূর্ণ সাংসারিক বোধ হইয়াছে। তাই, মিরন্দা, শকুন্তলা হইতে কপালকুণ্ডলার অপূর্ব্বত্ব অধিক। কপালকুণ্ডলার এই জীবনটি একবার দেখ, দেখি—এপারেও দেখিবে আমাদিগের সংসারের কিছু নাই। নবকুমারের প্রতি কপালকুণ্ডলার অনুরাগ বা মনোভাব কপালকুণ্ডলার এক অদ্ভুত বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব টুকু এত অপূর্ব্ব ও এত মধুর, যে শুদ্ধ এই টুকু যেন কপালকুণ্ডলাকে আমাদিগের হইতে এক পৃথক্ জীব করিয়া তুলিয়াছে। কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি মানবের মৌলিক প্রকৃতি—ঈষৎ পরিবর্ত্তিত বটে, কিন্তু তবু সামাজিক মানবের প্রকৃতি হইতে তাহা কত অন্তর! কবিবর আমাদিগকে এই প্রকৃতিটি দূরে রাখিয়া একবার দেখাইয়াছেন—আবার কাছে আনিয়া, তুলনায় আর একবার দেখাইয়াছেন। এই মৌলিক প্রকৃতির সহিত আমাদিগের সামাজিক প্রকৃতি তুলনা করিলে, আমাদিগের হৃদয় বিস্ময় রসে পরিপ্লুত হয়। সমাজ আমাদিগকে এখন এত দূরে আনিয়াছে? কোথায় কপালকুণ্ডলা—আর কোথায় আমরা—এই বিস্ময়টিও কপালকুণ্ডলার আর একটি সৌন্দর্য্য। সকল জড়াইয়া কপালকুণ্ডলা এত মনোহারিণী। এক এক রকম বলা গেল, কিন্তু স্বপ্নময়ী কপালকুণ্ডলাকে কিছুতেই বুঝাইতে পারিলাম না। সে নিশা-কুসুম হায়, আকাশের প্রতিমা ধরিতে গেলেই ভাঙ্গিয়া যাইবে।

২। পদ্মাবতী।

বঙ্কিম বাবুর কাব্যে প্রায়ই দুই একটী Duplicate চিত্র বর্ত্তমান থাকে। দুর্গেশনন্দিনীতে [illegible] শৈলেশ্বরের পার্শ্বে [illegible] চন্দ্রশেখরের পার্শ্বে [illegible], [illegible] পার্শ্বে রতি, কপালকুণ্ডলার চিত্র দেখিয়া কপালের পার্শ্বে মতিবিবি বা পদ্মাবতী বিরাজ করিতেছে। চিত্রগুলি এক প্রকারেরও নহে অথবা সম্বন্ধ স্পষ্ট বিরুদ্ধ প্রকারেরও নহে। একটি চিত্র দ্বারা যেন অন্যটির চিত্র সম্যক্ প্রতিভাসিত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই যুগল চিত্র একত্রিত হইয়াই যেন কোনও একটি ভাবের বা ঘটনার সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি পাঠকের মানস-পটে অঙ্কিত করিয়া দেয়। সেক্ষপীয়রের নাটকাবলীতে এইরূপ যুগল চিত্রের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ যুগল চিত্রের অঙ্কনে বিশেষ ক্ষমতার আবশ্যক। যেরূপ নাটকাদির দৃশ্যপট অঙ্কিত করিতে হইলে, চিত্রকরের অভিনিবেশ সহকারে মনে করিয়া লইতে হয়, কোনরূপ চিত্র এখন আঁকিলে দূর হইতে দর্শকবৃন্দ চিত্রটিকে চিত্রকরের অভীষ্টরূপে দেখিতে পাইবে, সেইরূপ এইরূপ যুগলচিত্র অঙ্কনেও কবির দেখিতে হইবে, চিত্রাঙ্করের কোন ভাবটি স্পষ্ট চিত্রান্তর দ্বারা প্রকাশিত করিলে যুগল চিত্র দেখিয়া দর্শকের মন চিত্রকরের অভিপ্রায় ভাবটি গ্রহণ করিতে পারিবে। যুগল চিত্র অঙ্কিত করিয়া কেহ এরূপ মনে করিবেন না, যে কোন চিত্র সাহায্য করিতে আর একটি মাত্র চিত্রই আবশ্যক হয়। কোন মহানদীর ব্যাখ্যা করিতে

দুই জন বা ততোধিক চিত্রে প্রতিফ[illegible] হইয়া থাকে। এক বিশেষের চিত্র, প্রত্য[illegible] [illegible] প্রতিভাসিত হইয়া থাকে। কপালের চিত্র, কপালকুণ্ডলা ও [illegible] দ্বারা পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহার মধ্যে [illegible] বেশ[illegible] [illegible] পদ্মাবতীর চিত্রপূর্ণ বিকশিত। তাই পদ্মাবতীর চিত্র আমরা এখানে [illegible] বোধ করিলাম।

কপালকুণ্ডলা যোগিনী—পদ্মাবতী [illegible]। কপালকুণ্ডলা প্রকৃতিপালিতা, [illegible] জ্ঞানভিজ্ঞা—পদ্মাবতী বাল্য-[illegible] বিবর্দ্ধিতা, [illegible] সম্যক অভিজ্ঞা। কপালকুণ্ডলা স্নেহময়ী—পদ্মাবতী [illegible]। কপাল [illegible]—পদ্মাবতী ইন্দ্রিয়াধীনা। কপালকুণ্ডলা [illegible]—পদ্মাবতী [illegible]। কপাল আত্মবিস্মৃতিময়ী—পদ্মাবতী স্বার্থ-[illegible], গর্ব্বিতা;—[illegible] বুদ্ধি [illegible] তাহার অভঙ্গার ছিল। এই সকল বিরোধ [illegible] বাহিরে [illegible] বিরুদ্ধভাবে [illegible] পড়িয়াছে তাহাও দেখা যাউক।

[illegible] রূপ-বর্ণনা [illegible] বর্ণনাচ্ছলে কবি [illegible]—"অপূর্ব্ব [illegible] মূর্ত্তি। [illegible]—অবেণীসম্বদ্ধ, [illegible], [illegible] [illegible] কেশভার, তদগ্রে [illegible] যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে [illegible] প্রকাশ হইতে ছিল না —তথাপি [illegible] চন্দ্রোশির [illegible] হইয়া ছিল। [illegible] কটাক্ষ [illegible] স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দীপ্তি [illegible] হইতেছিল কেশরাশিতে [illegible] আচ্ছন্ন করিয়াছিল। [illegible] অদৃষ্ট [illegible] কিছু কিছু [illegible] [illegible]। রমণীদেহ একেবারে নিরা-[illegible] মূর্ত্তি মধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্দ্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ, ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল, পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হই-তেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগর-কূলে সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনীশক্তি অনুভূত হয় না।"

পদ্মাবতীর [illegible] বর্ণনাস্থলে গ্রন্থকার পাঠকবর্গকে বলিতেছেন—"সেই উজ্জ্বল [illegible] অলকাবলী মনে করুন; সেই [illegible]-চন্দ্রাকৃতললাটতলস্থ [illegible] স্পর্শী [illegible] মনে করুন; সেই [illegible] [illegible] [illegible] মনে করুন; তন্মধ্যবর্ত্তী [illegible] [illegible] মনে করুন, তাহা হইলে এই রূপরাশির [illegible] [illegible] বালিকা [illegible] [illegible]। চক্ষু দুইটি অতি বিশাল নহে, কিন্তু সুবঙ্কিম [illegible]—[illegible] অতিশয় উজ্জ্বল। তাহার কটাক্ষ স্থির, অথচ মর্ম্মভেদী। তোমার উপর দৃষ্টি [illegible] তুমি [illegible] অনুভব কর যে, এ [illegible] তোমার মন পর্য্যন্ত দেখিতেছে। দেখিতে দেখিতে সে মর্ম্মভেদী দৃষ্টির ভাবান্তর হয়, চক্ষু সুকোমল [illegible] [illegible] যায়। আবার কখন বা তাহাতে সুখাবেশজনিত ক্লান্তি প্রকাশ পায়, যেন সে নয়ন মন্মথের স্বপ্ন-[illegible]। কখন বা লালসাবিস্ফারিত মন্মথমদে

টলটলায়মান। আবার কখন লোলাপাঙ্গে ক্রুর কটাক্ষ—যেন মেঘ মধ্যে বিদ্যুল্লতা। মুখকান্তি মধ্যে দুইটি অনির্বচনীয় শোভা; প্রথম সর্ব্বপ্রগামিনী বুদ্ধির প্রভাব, দ্বিতীয় অহঙ্কার আত্মগরিমা। এতৎকারণে যখন তিনি মরালগ্রীবা বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইতেন, তখন সহজেই বোধ হইত ইনি রমণীকুলরাজ্ঞী।"

এরূপ রূপবর্ণনা এক প্রকার চরিত্রবর্ণনা। কপালকুণ্ডলা ও পদ্মাবতীর আকৃতি দেখিয়াই যেন তাহাদিগের প্রকৃতি সিদ্ধান্ত করা যায়। ইহার অতিরিক্ত বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। এই চিত্র দুইটিতে দুই প্রকার অদৃষ্টবাদ বর্ণিত আছে। এক প্রকার প্রকাশিত, এক প্রকার প্রচ্ছন্ন। একটি মত বিশেষরূপ স্বীকৃত, অন্যটি প্রায় সর্ব্ববাদী সম্মত। কপালকুণ্ডলা ও পদ্মাবতী এই যুগল চিত্র অদৃষ্টবাদের যুগল মূর্ত্তি। আমরা শেষোক্ত অদৃষ্টবাদই আমাদের ব্যাখ্যার বিষয় ধরিয়া লইলাম। আমরা এস্থলে যাহা অদৃষ্টবাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে যাইতেছি, সমগ্র জগতে তাহা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমরা মহাকবির এই অদৃষ্টবাদটি সুস্পষ্ট করিয়া প্রতিফলিত করিয়া, মনোবিজ্ঞানের অতি কঠোর কথা কাব্যময় করিয়া ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময়রসে স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা তাহা এস্থলে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

মনুষ্য প্রকৃতি সমস্তই পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা গঠিত হইয়া থাকে। যেটুকু মনুষ্যত্ব সেই টুকুই মাত্র সাধারণের কথা সম্পত্তি—মানব চরিত্রের বীজস্বরূপ। মনুষ্য বলিলে যাহা বুঝায়, তিনি তাহা নহেন। অন্য যেকিছু আমরা মানবচরিত্রে দেখিতে পাই, তাহা অবস্থাভেদে জন্মিয়া থাকে। এক মনুষ্য বাল্যাবধি নানা লোকসঙ্গে আসিয়া শিক্ষিত হইয়া একটি মাত্র পদার্থ বোধ করিতে পারে। কিন্তু নাম ধরিয়া বলিলে তাহা পারা যাইবে না। মনুষ্য মাত্রই বিভিন্ন। ইংরাজিতে যাহাকে Accident বলে, আমরা তাহাকে অদৃষ্ট বলিলাম। যাহাকে তাহারা Differentia বলে, আমরা তাহাকে 'বীজ' বলিলাম। এই বীজের সহিত অদৃষ্টবাদ যুক্ত হইয়া মানবচরিত্র পৃথক করিয়া তুলিয়াছে। জগতে যত মানব জন্মগ্রহণ করিয়াছে সকলেরই বীজ এক, কেবল অদৃষ্ট বিভিন্ন।

এই অদৃষ্ট লোকের চতুষ্পার্শ্বস্থ অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। এই অবস্থাগুলির ক্ষমতা জ্ঞাত করিয়া বঙ্কিম এই মনস্তত্ত্ব ঠিক বুঝিয়া আমাদিগের জন্য কবি কপালকুণ্ডলা ও পদ্মাবতীর চরিত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সকল অবস্থার কথা কিছু প্রকাশ করা যায় না, যাহা যাহা অত্যন্ত পরিস্ফুট তাহাই মাত্র প্রদর্শিত হইতে পারে। এইজন্য কপালকুণ্ডলা ও পদ্মাবতীর চরিত্রজননীভূত শিক্ষার কথা আমরা বড় একটা দেখিতে পাইলাম না। মূলে আমরা তৎসকলেই এক প্রকৃতির সহিত সাক্ষাৎ নির্দিষ্ট দেখিতে পাইলাম। সেই প্রকৃতিটি স্বাধীনতা। একের স্বাভাবিকে স্বাধীন অবস্থায়, অপরের দুর্বলতা সহকারে, পদ্মার কানন-প্রদেশে স্বাধীনাবস্থায় জাতীয় মন লইয়া অবরোধের মধ্য ... পরিণত হইয়াছে। কপালকুণ্ডলা ও

পদ্মাবতীর জীবনে এই পাপলিপ্সা যেন বীজরূপে—অর্থ যাহা কিছু তাহাদিগের সংস্রবে ঘটিয়াছিল, সমস্তই অকস্মাতের।

কপালকুণ্ডলা কিরূপে পরিবর্দ্ধিতা হইয়া কিরূপে পরিণামপ্রাপ্তা হইয়াছিল, তাহা বলা হইয়াছে। এখন লুৎফউন্নিসা সম্বন্ধে দুএক কথা বলিব।

গ্রন্থকার লুৎফউন্নিসা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"এদিকে লুৎফউন্নিসা ক্রমে বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, আগ্রাতে আসিয়া তিনি পারসীক, সংস্কৃত, নৃত্য, গীত, রসবাদ ইত্যাদিতে গুণবতীদিগের মধ্যে অগ্রগণ্যা হইতে লাগিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার যাদৃশ শিক্ষা হইয়াছিল, নীতিসম্বন্ধে তাহার কিছুই হয় নাই। লুৎফউন্নিসার বয়স পূর্ণ হইলে প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, তাঁহার মনোবৃত্তি সকল দুর্দ্দম বেগবতী। ইন্দ্রিয়দমনে কিছুমাত্র ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। সদসতে সমান প্রবৃত্তি। এ কার্য্য সৎ, এ কার্য্য অসৎ, এমত বিচার করিয়া তিনি কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না; যাহা ভাল লাগিত তাহাই করিতেন। যখন সৎকর্ম্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন সৎকর্ম্ম করিতেন। যখন অসৎকর্ম্মে অন্তঃকরণ সুখী হইত, তখন অসৎকর্ম্ম করিতেন। যৌবনকালের মনোবৃত্তি দুর্দ্দম হইলে, যে সকল দোষ জন্মে, তাহা লুৎফউন্নিসার সম্বন্ধে জন্মিল।"

স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা একমায়ের দুই সন্তান। একটি সু, একটি কু। কপালের ভাগ্যে প্রায় সেই সু-টিই পড়িয়াছিল, পদ্মাবতীর পক্ষে কু-টিই ঘটিল। স্ত্রীলোকের প্রতিই এক মাত্র প্রকৃত অধিকার। এই অভিভাবক শূন্য হইয়া স্বাধীন একজন প্রধান ওমরাহের দুহিতা ঐশ্বর্য্য-শালিনী পদ্মাবতী, ভোগবিলাসী মহামহিম সম্রাটের রাজধানীতে তাঁহারই নিকটে থাকিয়া ঐরূপ না হইয়াই থাকিতে পারে না। লোকের উপরে সংসর্গের আধিপত্য, প্রকৃত—পদ্মাবতীর ভাগ্যে এই সংসর্গ কু-ই ছিল। এরূপ অবস্থায়ও সুযোগাভাবে অনেকে বাধ্য হইয়া সৎ থাকিতে পারে, পদ্মাবতীর পক্ষে তাহাও ঘটিল না। প্রথমে স্বেচ্ছাচারিতায় প্রবৃত্ত হইবার তাঁহার কোন নিমিত্ত ঘটে নাই; শেষে যখন তাঁহার পিতা কলঙ্কের কথা শুনিয়া তাঁহাকে গৃহ হইতেই বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন, তখনত তাহার চিন্তামাত্র রহিল না। কলঙ্কিত হইলামই তবে আর কেন পরমুখাপেক্ষী থাকি, এই ভাবিয়াই যেন পাপীয়সী পাপ-সমুদ্রে ঝাঁপ দিল। অবস্থাক্ষেত্রে তাহার অদৃষ্টবীজ এইরূপেই অঙ্কুরিত হইল।

কপালকুণ্ডলাও স্বাধীন প্রকৃতির। সেইরূপ অবস্থায় সেইরূপ শিক্ষায় পরিবর্দ্ধিত হইলে তাহা ত হইবেই। কিন্তু কপালের ভাগ্যে সংসর্গটি সু-ই হইয়াছিল। যেটুকু "কু" ছিল, তাহার কোন ক্ষমতাই ছিল না, কারণ সেই "কু" টুকুর নিরুদ্ধবল অভ্যাস প্রবল ছিল। কপালকুণ্ডলা চারিদিকেই ভৈরবীভক্তি দেখিতে পাইতেন। অধিকারী ও কাপালিক উভয়ই একান্ত দেবীভক্ত ও অদৃষ্টবাদী; কপালেও তাহাই হইল। স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ কপাল ভাল বুঝিত না। সেই লোকালয়-পরিশূন্য নিবিড় কানন প্রদেশে শৈশব হইতে পরিবর্দ্ধিতা কপা-

স্বভাবে শিক্ষারূপে যা দেখিয়া শুনিয়া তাহা শিখিতে পারিল না। তবে মনুষ্যের বীজগত যেটুকু শিক্ষা আছে, তাহা অবশ্য কপালেরও ছিল। কিন্তু তাহাও অতি প্রচ্ছন্ন ভাবে ছিল। অন্যবিধ চিন্তা-নিবিষ্ট কপালের মনে যৌবন স্বভাবসুলভ কোন চাঞ্চল্য থাকিলেও তাহা কপাল স্বয়ং তাহা অনুভব করিতে পারিত না। আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে হৃদয় মধ্যে অতি প্রচণ্ড পাপবীজও যখন লুক্কায়িত থাকিতে পারে—এতো অতি সহজ কথা।

এইরূপে আমরা গ্রন্থকারের অনুগ্রহে কপাল ও পদ্মার অদৃষ্ট উজ্জ্বলভাবে দেখিতে পাইলাম। অদৃষ্টও দর্শনীয় হইল। কপাল ও পদ্মা স্বাভাবিক চিত্র। এইরূপ যুগল চরিত্রের সমাবেশেই অদৃষ্ট-বাদটি এত সুন্দর ভাবে ফুটিয়া পড়িয়াছে।

আমরা এখন প্রত্যেকটীর চরিত্রের কার্য্যাংশ ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

লুৎফ-উন্নিসার জীবন-কাহিনী তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ নবকুমারের দর্শন-লাভ ও পরিচয় প্রাপ্তি পর্য্যন্ত পর্য্যবসিত, দ্বিতীয়ভাগ মেহের উন্নিসার নিকট জাহাঙ্গীরের প্রতি তাহার অনুরাগের কথা অবগতিতে পরিসমাপ্ত; তৃতীয়ভাগমধ্যে লুৎফউন্নিসার অবশিষ্ট বা পরিণাম বর্ণিত হইয়াছে। এই তিনটি ভাগ দিবা, সন্ধ্যা ও রজনীর ন্যায় সম্বন্ধবদ্ধ ও অবস্থানুযায়ী এইরূপই স্বাভাবিক। লুৎফউন্নিসার পাপপঙ্কিল দিবাভাগে প্রচণ্ড তাপে স্বয়ং উত্তপ্ত হইয়া যেন সন্ধ্যাসময়ে স্বতঃই নিস্তব্ধ হইয়া পড়িল, এবং রজনীতে যেন উহা জগৎ ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

জীবনের প্রথম ভাগে লুৎফ-উন্নিসা যৌবনের দুর্দ্দমনীয় পাপস্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসমান হইলেন। যেরূপ অবস্থায় একার্য্যটি ঘটিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে প্রদর্শন করিয়াছি। যথেচ্ছা ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা কিছু শমিত হইলে, লুৎফ-উন্নিসার আধিপত্যেচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। সেলিমের মহিষী হইবেন, ইহা তাঁহার স্থির প্রতিজ্ঞা হইল। যে যেরূপ অবস্থায় যেরূপ মন লইয়া যেরূপেই থাকুক না কেন, তাহার মনে অপেক্ষাকৃত উচ্চ আশা থাকিবেই। সেই আশাটীর প্রকৃতিও আবার অবস্থানুযায়ীই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। ভোগপরায়ণা লুৎফ-উন্নিসার ভোগ-লালসা একদিকে নির্ব্বিবাদে পরিতৃপ্ত হইতেছিল, কাজেই অন্যদিকে এখন তাহা পরিধাবিতা হইল। লুৎফ-উন্নিসা এখন সেলিমের প্রধান মহিষী হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এ আশা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অসমুচিতও হয় নাই। তাঁহার রূপ, গুণ, বিদ্যা, বুদ্ধি, রসজ্ঞতা প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, সেলিমও তাঁহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, তবে এরূপ আশা না হইবে কেন? কিন্তু লুৎফ-উন্নিসাকে শীঘ্রই এ আশা পরিত্যাগ করিতে হইল। মেহের-উন্নিসার প্রতি সেলিমের অনুরাগ দেখিয়াই তাঁহাকে ঠিক করিতে হইল যে, মেহের-উন্নিসাই সম্ভবতঃ সেলিমের মহিষী হইবেন। এক আশা যায়, অন্য আশা আসে—জগতের রীতিই এইরূপ। লুৎফ-উন্নিসা এ আশা ত্যাগ করিয়া অন্য এক দুরাকাঙ্ক্ষিক সংকল্প করিলেন। যুবরাজ সেলিমের পুত্র খসরুকে সিংহাসনে বসাইতে তাঁহার সঙ্কল্প হইল।

এ সঙ্কল্পের উদ্দেশ্য গুলি গ্রন্থকার এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

১। মেহের-উন্নিসার প্রতি সেলিমের অনুরাগ লুৎফ-উন্নিসার জ্ঞানগোচর। যাহাতে মেহের উন্নিসার সহিত সেলিম মিলিত হইতে না পারেন, এই ইচ্ছা লুৎফ-উন্নিসার হৃদয়ে আবির্ভূত হইল। খসরু সম্রাট হইলে, সেলিমের এ আশা পূর্ণ হইবে না।

২। রাজপুরীমধ্যে সামান্যা পুরস্ত্রী হইয়া থাকিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। খসরুকে সিংহাসনে বসাইতে পারিলে, পুরস্কার স্বরূপ কোন প্রধান রাজপুরুষের সর্ব্বময়ী ঘরণী হইবার সম্ভাবনা। আধিপত্যপ্রিয় লুৎফ-উন্নিসা ইহা অভীপ্সিত মনে করিলেন। অন্য কারণও আছে। রাজপুরীর মধ্যে থাকিয়া তাঁহার ভোগাসক্তের কিছু বিঘ্ন হইতেছিল, বাহিরে সেরূপ কোন বাধা হইবার সম্ভাবনা নাই।

৩। সেলিম যে তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া মেহের-উন্নিসার জন্য এত ব্যস্ত, এতদ্দ্বারা তাহারও প্রতিশোধ হইবে।

এই তিনটী উদ্দেশ্যের মধ্যেই লুৎফ-উন্নিসার সেই আধিপত্য-প্রিয়তা, প্রতিজিঘাংসা ও ভোগেচ্ছা বলবতী দেখিতে পাই। লোকের উদ্দেশ্য ত স্বভাবানুযায়ীই হইবে, তবে লুৎফউন্নিসার উদ্দেশ্য অন্যরূপ হইবে কেন?

সঙ্কল্প-সিদ্ধির জন্য যখন লুৎফউন্নিসা উড়িষ্যা গমন করিয়াই তথা হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন, তখনই তাঁহার সহিত নবকুমারের দেখা হয়। এই দর্শন ও পরিচয় পর্য্যন্তই তাঁহার জীবনের একভাগ বিস্তৃত। তাঁহার জীবনের এই অংশে সেই প্রকৃতি পরিলক্ষিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক বেজহট (Bagehot) মানব প্রকৃতিকে মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যাহাদিগের মনে সহজে প্রবৃত্তি নিবৃত্তিতে, জ্ঞানে ও অভিলাষে বিসম্বাদ হইয়া থাকে, তাহারা ইহার এক ভাগে অন্তর্নিবিষ্ট। আর যাহাদিগের মনে ভাবসমূহের কোন বিরোধ নাই, এক টানা জলের ন্যায় সে গতির কোন বিরোধ নাই, তাহাদিগকে তিনি অপর শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, যে, শেষের শ্রেণীস্থ লোককে হয় দেবতা না হয় অসুর হইতে হইবে।

কপাল ও পদ্মা এই শেষোক্ত শ্রেণীর উক্ত দুই প্রকার লোকের আদর্শ স্বরূপ। উভয়েই স্বাধীনা—স্বেচ্ছাচারিণী—কিন্তু এক জনের ইচ্ছা নির্ম্মল সলিলরাশির ন্যায় বক্ষ-দেশে বিমল চন্দ্রালোক প্রতিবিম্বিত করিয়া বিজন কাননাভ্যন্তরে আপন মনে বহিয়া যাইতেছিল, অপরের অভিলাষ অদৃষ্টদোষে পঙ্কিলতা প্রাপ্ত হইয়া, প্রখর সূর্য্যালোকে কলঙ্করাশি সুপ্রকাশিত করিয়া বহুজনসমাকুল নগরমধ্যে প্রবাহিত হইতেছিল। একটী দেবী, অন্যটি দানবী।

কিন্তু পদ্মাবতীর এই দানবী-প্রকৃতি চিরদিন এক রহিতে পারে নাই। কিছু দিনের জন্য আমাদিগের পূর্ব্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর প্রকৃতি প্রবল হইয়া পদ্মাবতীর গতি আবার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইয়াছিল। সুতরাং আমরা নির্ব্বিবাদে বলিতে পারি যে, এক পদ্মাতেই আমরা উভয় প্রকৃতি দেখিতে পাইয়াছি। পদ্মার জীবনের প্রথম ভাগ ও শেষ ভাগে সেই একটানা ভাব দেখিতে পাইলাম। মধ্যভাগে কিছু দিনের জন্য

তাহা দুই দিকেই প্রধাবিত হইয়াছিল। সেই সময়েতে নিবোধ ভাব পদ্মার জীবনের যে ভাগে আবির্ভূত হইয়াছিল, তাহাকেই পদ্মার Crisis বা সঙ্কট কাল বলিতে হইবে। আমরা একণে সেই সঙ্কটকাল সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিব।

স্বামীর নিকট পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া পদ্মাবতী শিহরিয়া উঠিলেন। একখানি বাষ্পীয় শকট যেন হৃদয় প্রদেশ দলিত করিয়া চলিয়া গেল। অতীতের স্মৃতি, স্বপ্নের ন্যায় হঠাৎ মনোমধ্যে জাগরূক হইল। এই ত সেই নবকুমার। যিনি বিধাতার অন্যরূপ ইচ্ছা না হইলে, আজ পদ্মাবতীর হৃদয়েশ্বর হইতেন! পদ্মাবতীও ক্ষণকালের জন্য আত্মবিস্মৃতা হইলেন। এই অবসরে অজ্ঞাতসারে পদ্মাবতীর পাষাণ-হৃদয়ে একটী সুবীজ রোপিত হইল।

বলা বাহুল্য যে পদ্মার হৃদয়ে এ ভাব বহুক্ষণ স্থায়ী হইল না। রূপাভিমানিনী পদ্মা নবকুমারকে মোহিত করিবার জন্য বেশভূষা করিয়া তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেই প্রফুল্লের কথা মনে পড়িল। যদি পদ্মার মতি সম্যক পরিবর্ত্তিত হইত, তাহা হইলে তাহাকে আবার এখানে সেইরূপ নিরাভরণা দেখিতে পাইতাম। আর এক দিন দেখিতেও পাইয়াছি। কিন্তু গর্ব্বিতা পদ্মাবতী প্রফুল্ল নহে—রূপ ও ধনের প্রভাব দেখাইবার অভিলাষ, লোকমন মোহিত করিবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা পদ্মাবতী ছাড়িতে পারিল না। এইরূপে সজ্জিতা হইয়া পদ্মাবতী স্বামীর সহিত সপত্নী সম্ভাষণে চলিলেন। প্রকৃতি সজ্জিতা নিরাভরণা কপালকুণ্ডলাকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখিয়া পদ্মাবতীর অধর পার্শ্বে ও নয়ন প্রান্তে ঈষৎ হাসি দেখা দিল। বুঝি পদ্মা মনে মনে তখন নবকুমারকে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, 'আমার সম্মুখে কি এই রূপের গর্ব্ব করিয়াছিলে?' রূপাভিমানিনীর এ মনোভাব স্বাভাবিক। কিন্তু যখন আলিত প্রদীপালোকে কপালের রূপ রাশি বিভাসিত হইয়া পড়িল, তখন পদ্মার সে হাসি হাসি ভাব দূর হইল। পদ্মার মুখ গম্ভীর হইল;—পদ্মা অনিমিষলোচনে কপালকুণ্ডলাকে দেখিতে লাগিল। কেহ কোন কথা কহে না;—মতি মুগ্ধা, কপালকুণ্ডলা কিছু বিস্মিতা।

অভিমানেরও একটা সীমা আছে।

পদ্মাবতী কপালকে স্বকীয় গাত্রালঙ্কারে সজ্জিত করিয়া তাহার রূপের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এ অলঙ্কার-দান বা এ সব ব্যাপার যে কেবল মাত্র কপালের রূপের জন্য হইয়াছিল আমরা এরূপ বোধ করি না। নবকুমারের পত্নী না হইলে কপাল আজ এরূপ আদৃতা হইত কি না সন্দেহ। নবকুমারের প্রতি পদ্মার আসক্তির সঞ্চার ইহাতেও প্রকাশ পাইয়াছে। "আপনিও কখন কখন পরাইয়া মুখরা বিদেশিনীকে মনে করিবেন" এই কথাটিতে তাহা কিছু ফুটিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এখনও আমরা এ সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই; যখন [illegible] মতি বিবিকে জিজ্ঞাসা করিল "বিবি এ ব্যক্তি কে?" এবং গর্ব্বিতা পদ্মাবতী উত্তর করিল 'মেরা খসম', তখন সব বুঝিলাম। 'মেরা খসম'—কি সুন্দর ভাবেই কথাটি

বসান হইয়াছে। সেলিম-পারিণয়-প্রার্থী পদ্মাবতী যেন গর্ব্বঅহঙ্কারে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া পেষমনকে উত্তর করিল 'মেরা খসম'। সাধারণ ভাবে পদ্মার এ গর্ব্ব সমূদিত হয় নাই। পদ্মা এখন নবকুমারের প্রতি সত্যই আসক্তা।

পদ্মাবতীর পূর্ব্ব মনোভাব পাঠকবর্গ অবগত আছেন। সেলিমের মহিষী হইতে যাহার অভিলাষ, সে আজি নবকুমারের প্রণয়প্রার্থী হইল। দুটী বিরুদ্ধ ভাবের সংঘর্ষণ উপস্থিত হইল। একদিকে আধিপত্যেচ্ছা ও কুমতি, অন্যদিকে প্রণয় ও সুমতি সজ্জিত হইয়া পদ্মার হৃদয়প্রদেশে সংগ্রাম করিতে লাগিল। এই বিরুদ্ধ ভাব লইয়া পদ্মাবতী মেহেরউন্নিসারকাছে বর্দ্ধমানে যাইতে ছিলেন। সকল বিষয়েরই নূতন যেমন আদর পায়, পুরাতন সেরূপ নহে। আজ পদ্মার নিকট সুমতি ও প্রণয় নূতন পদার্থ। পদ্মা কিছু তদ্দিকেই বেশী আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। তোমরা সুমতির বাহাদুরি বজায় রাখিতে ইচ্ছা হইলে, তাহার বলাধিক্য বর্ণনা করিতে পার, আমরা কিন্তু নূতন বলিয়াই পদ্মার মনে এরূপ ভাবপ্রাবল্য হেতু ব্যাখ্যা করিব। প্রণয়ের ও সুমতিরও যে কিছু ক্ষমতা না ছিল এমত নহে, তবে তদপেক্ষা তাহাদিগের নূতনত্বেই যেন পদ্মার আকর্ষণ বেশী স্বাভাবিক বোধ হয়।

বঙ্কিম বাবু একস্থলে প্রণয়-লক্ষণের মধ্যে বিনা প্রসঙ্গে প্রণয়পাত্রের কথা উত্থাপন একটি লক্ষণ বলিয়া গিয়াছেন। আমরা বর্দ্ধমানের পথে পদ্মাকে আজ সেই লক্ষণাক্রান্ত দেখিব।

যে দিন নবকুমারকে বিদায় করিয়া মতি বিবি বা লুৎফউন্নিসা বর্দ্ধমানাভিমুখে যাত্রা করিলেন, সেদিন তিনি বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত যাইতে পারিলেন না। অন্য চটিতে রহিলেন। সন্ধ্যার সময়ে পেষমনের সহিত একত্র বসিয়া কথোপকথন হইতে ছিল, এমত কালে মতি সহসা পেষমনকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

'পেষমন! আমার স্বামীকে কেমন দেখিলে?'

"পেষমন, কিছু বিস্মিত হইয়া কহিল, 'কেমন আর দেখিব?'

"মতি কহিলেন 'সুন্দর পুরুষ বটে কি না?'

লক্ষণের সহিত সর্ব্বতোভাবে ঐক্য হইল। পেষমনের সহিত এরূপ ভাবে কথা বার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় অন্য এক সম্বাদ উপস্থিত হইল। খস্রুকে সিংহাসনারোহণের চেষ্টা বিফল হইয়াছে, আগ্রা হইতে এরূপ সংবাদ আসিল। নবকুমার-চিন্তা এখন কিছু কালের জন্য অন্তর্হিত হইল। এই সময়কার কিছু কথোপকথনও এখানে উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

অনুপায় দেখিয়া পেষমন বলিল 'তবে কি হইবে?'

মতি কহিলেন 'এক ভরসা আছে। মেহেরউন্নিসার চিত্ত জাহাঁগীরের প্রতি কিরূপ? তাহার যেরূপ দার্ঢ্য, তাহাতে যদি সে জাহাঁগীরের প্রতি অনুরাগিনী না হইয়া স্বামীর প্রতি যথার্থ স্নেহশালিনী হইয়া থাকে, তবে জাহাঁগীর শত সের-আফগান বধ করিলেও মেহের-উন্নিসাকে পাইবেন না। আর যদি মেহেরউন্নিসা জাহাঁগীরের যথার্থ অভিলাষিণী হয়, তবে আর কোন ভরসা নাই।'

পে। মেহেরউন্নিসার মন কি প্রকারে জানিবে?

মতি হাসিয়া কহিলেন, 'লুৎফ-উন্নিসার অসাধ্য কি? মেহের-উন্নিসা আমার বাল্যসখী, কাল বর্দ্ধমানে গিয়া তাহার নিকট দুই দিন অবস্থিতি করিব।

পে। যদি মেহেরউন্নিসা বাদশাহের অনুরাগিনী না হন, তাহা হইলে কি করিবে?

ম। পিতা কহিয়া থাকেন, 'ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।'

উভয়ে ক্ষণেক নীরব হইয়া রহিলেন। ঈষৎ হাসিতে মতির ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হইতে লাগিল। পেষমন জিজ্ঞাসা করিল 'হাসিতেছ কেন?'

মতি কহিলেন 'কোন নূতন ভাবের উদয় হইতেছে।'

পে। কি নূতন ভাব?

মতি তাহা পেষমনকে বলিলেন না।"

যে পরিমাণে পদ্মার একদিক্‌কার আশা কমিতে লাগিল, সেই পরিমাণে তাহার অন্য দিক্‌কার সঙ্কল্প সুস্থির হইতে লাগিল। শান্তি পদ্মার ভাগ্যে ছিল না।

পদ্মাবতীর জীবনের মধ্যভাগের কথা বলিতে গিয়া একটি কথা মনে পড়িল। পদ্মার সহিত মেহের-উন্নিসার সাক্ষাতে ও কথোপকথনে আমাদিগের কবিবর তাঁহার এক চমৎকার পরিচয় দিয়াছেন। কপালকুণ্ডলার তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদ নাটকাংশে উপন্যস্ত।

মতিবিবি ও মেহের-উন্নিসা প্রতিযোগিনীদ্বয় একমনে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন। উভয়েই চতুরা, উভয়েই বাক্‌পটু উভয়েই নিজের মনের কথা না বলিয়া অন্যের মনের সংবাদ জানিতে চেষ্টিত। মেহের-উন্নিসা বসিয়া কি লিখিতেছেন। পদ্মা তাঁহার পৃষ্ঠের নিকট বসিয়া চিত্র লিখন দেখিতেছিলেন ও তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলেন, কি ছলে সেলিমের কথা উত্থাপন করিবেন। চতুরা পদ্মাকে অনেকক্ষণ এ কথা ভাবিতে হয় নাই। তিনি চিত্রলিখন উপলক্ষে মেহের-উন্নিসার সৌন্দর্য্যের কথা উত্থাপন করিয়া, সেলিমের প্রতি সেই সৌন্দর্য্যের প্রভাব বর্ণনা করিবেন ও তদ্দ্বারা মেহের-উন্নিসার মনোগত ভাব কতক স্পষ্ট কথায় ও কতক কথোপকথনের ভাবে বুঝিয়া লইবেন, এইরূপ স্থির করিলেন। তাই মেহের-উন্নিসা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চিত্র কেমন দেখিতেছ?' পদ্মাবতী উত্তর করিলেন 'তোমার চিত্র যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাই হইতেছে। অন্য কেহ যে তোমার ন্যায় চিত্রনিপুণ নহে, তাই দুঃখের বিষয়।'

মেহে। তাই যদি সত্য হয় ত দুঃখের বিষয় কেন?

চতুরা মতিবিবি সুযো
লেন 'অন্যের তো
থাকিলে তোম
পীড়িত।'
সেই
মুখে
তপ
গুণি
কা

একটি দুঃখের স্রোত বহিতেছে যে তাঁহার এ সৌন্দর্য্যের প্রকৃত ব্যবহার হইল না। বিবাহিতা স্ত্রীর পক্ষে এ লক্ষণটি বড় ভাল নহে। লুৎফউন্নিসা সুযোগ পাইলেন। মেহের-উন্নিসার এই দুঃখোচ্ছ্বাস ধরিয়া তাঁহার মনের কথা বাহির করিতে পারিবেন ভাবিয়া যেন ঈষৎ হর্ষের সহিত বাঁকিয়া বসিয়া কথাটির সূত্র ধরিলেন। কিন্তু এবারে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। মেহেরউন্নিসা এ প্রশ্নের গতি পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। লুৎফউন্নিসার অস্ত্র ব্যর্থ হইল। মেহের সগর্ব্বে আত্মরক্ষা করিলেন। কথোপকথন চলিতে লাগিল। এবারে মেহেরউন্নিসাই আক্রমণকারী—লুৎফউন্নিসা যখন বলিলেন যে, 'আরও বিলম্বে অসন্তোষের কারণ জন্মিতে পারে' মেহের নিজের ভুবনমোহনী হাসি হাসিয়া কহিলেন 'কাহার অসন্তোষের আশঙ্কা করিতেছ? যুবরাজের না তাঁহার মহিষীর?'—আমরা আবার গণিলাম

...—বিনা প্রসঙ্গে সেলিমের কথা
...ই। লক্ষণ আরও মন্দ।
...স্বাঘাত গায় পাতিয়া
...আবশ্যক বোধ
...লিমের কথা
...স্থ। মতি
...লজ্জা-
...য়?
...ব
...ম
...ম

দুর?' আমরা আবার গণিলাম নং ৩। মেহের ক্রমে উঠিতেছেন। সেলিমের খাসবেগমের কথা তাঁহার অন্তরের সদালোচ্য বিষয়। সেই বিষয়ের প্রসঙ্গ উঠাইলেন। লুৎফউন্নিসা এবারে আত্মরক্ষার্থ একটু আক্রমণও করিলেন। দিল্লীশ্বরের মহিষীর দুঃখের ভাগটুকু ইঙ্গিতে প্রকাশ করিলেন। বুঝি মনে করিলেন, ইহাদ্বারা মেহেরের সে পদ কত দূর বাঞ্ছনীয় পরীক্ষা করিলেন। লুৎফউন্নিসার আবার জয় হইল। মেহের বলিলেন 'যে দিল্লীশ্বরের প্রধানা মহিষী হইবে তাহার উড়িষ্যায় আসিবার প্রয়োজন?' আমরা গণিলাম নং ৪। এ বাসনা মেহেরউন্নিসার কাছে 'স্বর্গাদপি গরীয়সী।' লুৎফউন্নিসা ভাবিলেন, মেহের উন্নিসার হৃদয়ে উল্লাস উঠিয়াছে। তাই কিছু স্পষ্টতর হইয়া বলিলেন 'সেলিমের প্রধানা মহিষী হইব, এমন স্পর্দ্ধা কখন করি না। এ হিন্দুস্থান দেশে কেবল মেহের-উন্নিসাই দিল্লীশ্বরের প্রাণেশ্বরী হইবার উপযুক্ত।' এবার কথাটি কিছু প্রকাশিত হইয়া পড়িল। মেহের-উন্নিসা মুখ নত করিলেন। আত্মসংযম করিয়া বলিলেন,

'ভগিনি! আমি এমত মনে করি না যে, তুমি আমাকে পীড়া দিবার জন্য এ কথা বলিলে, কি আমার মন জানিবার জন্য বলিলে। (আমরা আবার গণিলাম নং ৫—এ কথা কেন?) কিন্তু তোমার নিকট আমার এই ভিক্ষা, আমি যে সের-আফগানের বনিতা, আমি যে কায়মনোবাক্যে সেরআফগানের দাসী, তাহা তুমি বিস্মৃত হইয়া কথা কহিও না।"

"লজ্জাহীনা মতি এ তিরস্কারে অপ্রতিভ হইলেন না। বরং আরও সুযোগ পাইলেন, 'তুমি যে পতিগতপ্রাণা তাহা আমি বিলক্ষণ জানি। সেই জন্যই ছলক্রমে এ কথা তোমার সম্মুখে পাড়িতে সাহস করিয়াছি। সেলিম যে এ পর্য্যন্ত তোমার সৌন্দর্য্যের মোহ ভুলিতে পারেন নাই, এই কথা বলা আমার উদ্দেশ্য। সাবধানে থাকিও।'

চতুরা পদ্মার এক উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। প্রকারান্তরে তিনি মেহের উন্নিসার প্রতি সেলিমের অনুরাগ জানাইলেন। এ বড় বিষম কথা। তোমাকে একজন ভালবাসে, এ কথা তোমার নিকট বলিয়া অনায়াসেই তৎপ্রতি তোমার অনুরাগ আছে কি না অতি সহজে জানিতে পারা যায়। লুৎফউন্নিসা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এখন প্রায় সিদ্ধকাম হইতে চলিলেন। এ কথায় মুখ্য ফল কিছু হইল না। বুদ্ধিমতী মেহের উন্নিসা যেন মোটা কথায় আত্মরক্ষা করিলেন; এ আর আশ্চর্য্য কি? তিনি বলিলেন 'এখন বুঝিলাম। কিন্তু কিসের আশঙ্কা?' লুৎফউন্নিসা আবার মর্ম্মভেদী বাণ নিক্ষেপ করিলেন। বলিলেন 'বৈধব্যের আশঙ্কা।' এই কথা কহিয়া তিনি মেহের-উন্নিসার মুখপানে তীক্ষ্ণদৃষ্টি করিয়া রহিলেন, কিন্তু ভয় ও আহ্লাদের কোন চিহ্ন তথায় দেখিতে পাইলেন না।" চতুরা মেহের-উন্নিসা সদর্পে কহিলেন বৈধব্যের আশঙ্কা! শের আফগান আত্মরক্ষায় অক্ষম নহে। বিশেষ আকবর বাদসাহের রাজ্য মধ্যে তাঁহার পুত্রও বিনাদোষে পরপ্রাণ নষ্ট করিয়া নিস্তার পাইবেন না,—আমরা আবার গণিলাম নং ৫। আকবর বাদসাহের জীবিতাবস্থা ও তদবস্থায় মেহের-উন্নিসার মনোবাসনা পূরণের অসম্ভাবিতা মেহেরউন্নিসার মনে সর্ব্বদা জাগরূক হইত।

আকবরের মৃত্যু না হইলে, মেহের-উন্নিসার এজন্য অধীর হওয়া বৃথা, ইহা তিনি বেশ বুঝিতেন। কথাটি অন্যভাবে খুলিয়া আসিল। লুৎফউন্নিসা বুঝিলেন কি না জানি না। তিনি বলিলেন 'সত্য কথা, কিন্তু সম্প্রতিকার আগ্রার সংবাদ এই যে, আকবর শাহ গত হইয়াছেন। সেলিম সিংহাসনারূঢ় হইয়াছেন। দিল্লীশ্বরকে কে দমন করিবে?' মেহেরউন্নিসা কি আর স্থির থাকিতে পারেন? "তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিতে লাগিল। আবার মুখ নত করিলেন, লোচনযুগলে অশ্রুধারা বহিতে লাগিল। মতি জিজ্ঞাসা করিলেন 'কাঁদ কেন?' মেহেরউন্নিসা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 'সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে আমি কোথায়?'

বাঁধ ভাঙ্গিল। নির্ঝরিণী পর্ব্বত-গহ্বর হইতে ঝর ঝর রবে ছুটিয়া পড়িল। সংযমিত হৃদয়ের আবেগ মুক্তরশ্মি হইল। কেন যে হইল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই এক রূপ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছি।

মতির মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। গ্রন্থকার লিখিলেন "যিনি পরে আত্মবুদ্ধি-প্রভাবে দিল্লীশ্বরেরও ঈশ্বরী হইয়াছিলেন, তিনিও মতির নিকট পরাজিতা হইলেন। ইহার কারণ মেহেরউন্নিসা প্রণয়শালিনী, মতিবিবি এ স্থলে কেবল মাত্র স্বার্থপরায়ণা।"

কি বলিয়া যে এই অধ্যায়টির প্রশংসা করিব, জানি না।

গ্রন্থকার আবার লিখিলেন,

"এ সিদ্ধান্তে মতির আশা ভরসা সকলই নির্মূল হইল। কিন্তু তাহাতে কি মতি নিতান্তই দুঃখিত হইলেন? তাহা নহে; বরং ঈষৎ সুখানুভবও হইল। কেন যে এমন অসম্ভব চিত্তপ্রসাদ জন্মিল, তাহা মতি প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আগ্রার পথে যাত্রা করিলেন। পথে কয়েকদিন গেল। সেই কয়েক দিনে আপন চিত্তভাব বুঝিলেন।"

মতি যে কেন ইহা তখন বুঝিল না অথচ আনন্দিত হইল, আমরা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। মতি যদি তাহা বুঝিত, আমরাও তাহা একরূপ বুঝিতাম যে, এরূপ অনেক সময় ও অবস্থার সমাবেশ হয় যে, একদিকে প্রলোভনের দারুণ আকর্ষণ, অন্যদিকে প্রলোভনত্যাগেচ্ছা মানব-হৃদয়ে বিষম বিরোধ জন্মাইয়া দেয়। মনে ভাবি যে, প্রলোভন ত্যাগ করিলে ভাল হয়, ত্যাগ করা উচিত, অথচ এরূপ ক্ষমতা নাই যে, সে প্রলোভন সম্মুখে রাখিয়া ত্যাগ করিতে পারি। এরূপ অবস্থায় যদি কোন ঘটনা বশতঃ প্রলোভনটি স্বতঃই দূরীভূত হয়, আমাদিগের হৃদয়ে আনন্দ ধরে না। কোন একটি মদ্যপ বিশেষ প্রতিজ্ঞা করিল যে, সে আর কখন মদ খাইবে না, কিন্তু তাহার এমন ক্ষমতা নাই যে হাতে পাইলে সে মদ ত্যাগ করিতে পারে। সে গৃহে আসিয়া দেখিল, টেবিলের উপর একটি মদের বোতল রহিয়াছে। সেই লুচি-মণ্ডার পাত্র সমীপে উপবিষ্ট রুগ্ন পেটুক ব্রাহ্মণের ন্যায় ভাবিতে ভাবিতে সে সেই মদ্যপাত্র সমীপে গেল। গিয়া দেখিল যে সে মদ্যপাত্রে জল রহিয়াছে, মদ্য নাই; এরূপাবস্থায় তাহার মনে যেরূপ ভাব হইবে, পদ্মাবতীর তাহাই হইল। বিনা আয়াসে প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিয়া তাহার এ আনন্দ হইল। কিন্তু এরূপ আনন্দ ত অজ্ঞাতসারে হইতে পারে না; এ আনন্দের কারণ বুঝিতেই ত আনন্দ, তাই বলিতেছিলাম যে, শেষের কথাগুলি না থাকিলে ইহা একরূপ বুঝিতাম।

এইরূপে পদ্মাবতী নিরাবেশে সঙ্কট কাল অতিবাহিত করিলেন। নরকুমারের প্রতি আসক্তি এখন নির্ব্বিবাদে একটানা স্রোতে হৃদয় মধ্যে প্রবাহিত হইল। পদ্মাবতী জীবনের তৃতীয় কালে উপনীত হইলেন।

এই কালের বর্ণিতব্য বিষয় দুইটি; পদ্মাবতীর অনুতাপ ও আত্মত্যাগ। আমরা যথাক্রমে এখন তাহা বলিতে চেষ্টা করিব।

পদ্মাবতীর সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিল। গ্রন্থকার পঞ্চম পরিচ্ছেদে ইহার অতি সুন্দর পরিচয় প্রদান করিলেন।

"লুৎফ-উন্নিসা আজ আত্মমন্দিরে। বেশ ভূষা পরিত্যক্ত হইয়াছে—নয়নে পূর্ব্বে যেরূপ একটি বিদ্যুৎ কটাক্ষ প্রকাশ পাইত তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। পদ্মা পেষমনকে কহিতেছেন "এই পোষাকটী তুমি লও।" এতদুপলক্ষে পেষমনের সহিত তাহার যে কথোপকথন হইল, তাহার সমস্তগুলি বলিবার এখানে স্থান নাই। লুৎফ-উন্নিসার আগ্রা ত্যাগ সংবাদ শুনিয়া যখন পেষমন্ কহিল "এমন কুপ্রবৃত্তি আপনার কেন জন্মিল?" লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন।

কুপ্রবৃত্তি নহে। অনেক দিন আগ্রায় বেড়াইলাম কি ফল লাভ হইল? সুখের তৃষা বাল্যাবধি বড়ই প্রবল ছিল। সেই তৃষার পরিতৃপ্তি জন্য বঙ্গদেশ ছাড়িয়া এ পর্য্যন্ত আসিলাম। এ রত্ন কিনিবার জন্য কি ধন না দিলাম? কোন দুষ্কর্ম্ম না করিয়াছি? আর যে যে উদ্দেশে এতদূর করিলাম তাহার কোনটাই বা হস্তগত হয় নাই? ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, ধন, গৌরব, প্রতিষ্ঠা সকলইত প্রচুর পরিমাণে ভোগ করিলাম। এত করিয়াও কি হইল? আজ এইখানে বসিয়া সকল দিন মনে মনে গণিয়া বলিতে পারি যে, একদিনের তরেও সুখী হই নাই? এক মুহূর্ত্ত-জন্য কখন সুখভোগ করি নাই। কখন পরিতৃপ্ত হই নাই। কেবল তৃষা বাড়ে মাত্র। চেষ্টা করিলে আরও সম্পদ, আরও ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারি, কিন্তু কি জন্য? এসকলে যদি সুখ থাকিত, তবে এত দিন এক দিনের তরে সুখী হইতাম। এই সুখাকাঙ্ক্ষা পার্ব্বতী নির্ঝরিণীর ন্যায় —প্রথমে নির্ম্মল ক্ষীণধারা বিজন প্রদেশ হইতে বাহির হয়, আপন গর্ভে আপনি লুকাইয়া রহে, কেহ জানে না, আপনা আপনি কল কল করে, কেহ শুনে না। ক্রমে যত যায় তত দেহ বাড়ে, তত পঙ্কিল হয়, শুধু তাহাই নয়; কখন আবার বায় বহে, তরঙ্গ হয়, মকর কুম্ভীরাদি বাস করে। আরও শরীর বাড়ে, জল আরও কর্দ্দমময় হয়, লবণময় হয়, অগণ্য সৈকতচর মরুভূমি নদী-হৃদয়ে বিরাজ করে, বেগ মন্দীভূত হইয়া যায়, তখন সেই সকর্দ্দম নদী-শরীর অনন্ত সাগরে কোথায় লুকায় কে বলিবে?"

পে। আমি ইহার ত কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এ সবে তোমার সুখ হয় না কেন?

লু। কেন হয় না তাহা এত দিনে বুঝিয়াছি। তিন বৎসর রাজপ্রসাদের ছায়ায় বসিয়া যে সুখ না হইয়াছে, উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের পথে একরাত্রে সে সুখ হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতেছি।

পে। কি বুঝিয়াছ?

লু। আমি এত কাল হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তির মত ছিলাম। বাহিরে সুবর্ণরত্না-দিতে খচিত; ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয়-সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি কখন আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি, যদি পাষাণ মধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্ত-শিরা-বিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই?

পে। এও ত কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

লু। আমি এই আগ্রায় কখনও কাহাকেও ভালবাসিয়াছি?

পে। (চুপি চুপি) কাহাকেও না।

লু। তবে পাষাণী নইত কি?

পে। তা এখন যদি ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, তবে ভালবাস না কেন?

লু। মানস ত বটে। সেই জন্য আগ্রা ত্যাগ করিয়া যাইতেছি।

পে। তারই বা প্রয়োজন কি? আগ্রায় কি মানুষ নাই যে চুয়াড়ের দেশে যাইবে? এখন যিনি তোমাকে ভালবাসেন তাঁহাকে কেন ভালবাস না? রূপে বল, ধনে বল, ঐশ্বর্য্যে বল, যাহাতে বল, দিল্লীর বাদশাহার বড় পৃথিবীতে কে আছে?

লু। আকাশে চন্দ্র সূর্য্য থাকিতে জল অধোগামী কেন?

পে। কেন?

লু। ললাট লিখন।

লুৎফ উন্নিসা সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। পাষাণ মধ্যে অগ্নি প্রবেশ করিয়াছিল। পাষাণ দ্রব হইতেছিল।”

কি তীব্র মর্ম্মভেদী অনুতাপ! আগুণের ন্যায় যেন ইহা পদ্মাবতীর হৃদয় প্রদেশ দগ্ধ করিয়া বাহিরে প্রকাশ হইতেছিল। পদ্মাবতীর শিক্ষাফল এই অনুতাপ-সূচক বাক্যাবলীতে প্রকাশিত রহিয়াছে। এ অনুতাপ সামান্যা রমণীর নহে—এ অনুতাপ জ্ঞানবতী, সুশিক্ষিতা অথচ পাপানিরতা কামিনীর। পদ্মার এ অনুতাপ না জানি পৃথিবীর কত শত লোককে শিক্ষা প্রদান করিতে সমর্থ। কিন্তু শুধু শিক্ষায় কি হয়?

আমরা পদ্মার এ অনুতাপ সম্বন্ধে দুইটি কথা বলিব। একটি, এই অনুতাপ এরূপ সহসা কেন উৎপন্ন হইল? আর একটি, এ অনুতাপের প্রকৃতি ইহার অন্তর্নিহিত সত্য ও নির্ম্মল জ্ঞান।

অভিলষিত পাপ কার্য্যে বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় এ অনুতাপের সূচনা হইল। আরও এক কথা। নিয়ত নির্ব্বিবাদে পাপাচরণ করিতে পাইয়া পাপের স্পৃহা সহজেই পদ্মাবতীকে ছাড়িয়া চলিতেছিল। যদি সে এরূপ স্বেচ্ছাচারিণী না হইতে পারিত, তাহার এ পাপস্পৃহা পরিত্যাগে আরও কিছু সময় আবশ্যক হইত। ইহাও জগতের রীতি। এইজন্যই জগাই মাধাই যখন ধার্ম্মিক হইল, তখন তাহারা সাধারণ মনুষ্য হইতে অনেক উচ্চে উঠিল। এই কারণেই ইংরাজিতে প্রবাদ আছে যে Best men are moulded out of faults.

অনুতাপের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, পাপে পাপ বলিয়া পদ্মাবতী তাহা ত্যাগ করে নাই। পাপে সুখ নাই বলিয়া শান্তি নাই বলিয়া সে তৎস্পৃহাত্যাগ করিল। সুখান্বেষণই মানুষের মৌলিক প্রকৃতি।

‘ধর্ম্ম সুখের জন্য’ এ কথাটি সত্য ও প্রকাশযোগ্য। ইহা গোপন করিলে অনিষ্ট বই ইষ্ট হয়না। ধর্ম্মে আর কি আছে? ধর্ম্মাচরণই সুখ ও ধর্ম্ম সুখের জন্যই বটে।

পদ্মাবতী আরও একটি তত্ত্ব বুঝাইয়া দিয়াছেন। সুখের জন্য হাহাকার করিয়া বেড়াইলে কিছুতেই সুখ হয় না। যে প্রকৃত সুখ চাহিবে, কিছু কালের জন্য তাহাকে সে কথা ভুলিয়া নিষ্কাম ভাবে যথা কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে। এই যথাকার্য্য সম্পাদনই ধর্ম্ম। এবং এইরূপ নিষ্কাম ভাবে তাহা আচরণ করিলেই সুখ হইবে। কহিয়া বলিয়া সুখ ধরা যায় না। মনের খবর জানিতে পারিলে, নিশ্চয়ই এ সুখ পলাইবে।

পদ্মার জীবনের প্রথমভাগে আসক্তির প্রাবল্য পরিলক্ষিত হয় না। লুৎফ-উন্নিসা স্বমুখেই বলিয়াছেন তিনি আগ্রায় কখনও কাহাকে ভাল বাসেন নাই। সেলিমের রমণীজিৎ কান্তিও কখন তাহাকে মুগ্ধ করে নাই। গ্রন্থকার স্বয়ং তাহাকে পাষাণ-হৃদয় বলিয়াছেন। আসক্তিটা লোকের মৌলিক প্রকৃতি। পদ্মাতে তবে তাহা বিকশিত হয় নাই কেন? আমরা ইহার কারণ এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে চাহি। আসক্তিতে একটা বন্ধন স্বীকার করা চাই। ভালবাসা এক প্রকার অধীনতা।

স্বাধীনতা-প্রিয় পদ্মা তাহা স্বীকার করিতে চাহিত না। সামান্য বারস্ত্রীর ন্যায় অর্থ, সম্পদ, সম্মান ও ইন্দ্রিয় সুখই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। ইহার প্রত্যেকটিই ভালবাসার শত্রুস্বরূপ। সুতরাং মানুষে তাঁহার আসক্তি না জন্মিয়া যথেচ্ছা ইন্দ্রিয় সুখ-পরিতৃপ্তি ও বিষয় ভোগ বাসনায় তাঁহার আসক্তি ছিল। এইরূপ সুখে আসক্তি থাকা প্রযুক্ত, কোন একটি মনুষ্যে তাঁহার আসক্তি স্থির থাকিতে পারে নাই। ইন্দ্রিয়-জনিত যে মনুষ্য প্রতি একটা আসক্তি, তাহাও পদ্মাতে স্থির থাকিতে পারিত না; কারণ ইন্দ্রিয়-সুখের সঙ্গে সঙ্গে সম্পদ ও সম্মান প্রভৃতিরও একটি উচ্চ আশা পদ্মার মনে ছিল। এ সমুদয় জড়াইয়া, সেলিমের প্রতি তাঁহার আসক্তির সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু মেহেরউন্নিসার প্রতি অনুরক্ত সেলিমের প্রতি, গর্ব্বিতা পদ্মার আনুরক্তি হইল না। প্রত্যুত ইহাতে সে সেলিমের প্রতি বিরক্তই হইল। পদ্মা নিজের সুখকে বড়ই ভাল বাসিত। এই স্বার্থপরায়ণতার জন্য তাহার আসক্তি কোন খানে জমাট বাঁধে নাই। এইরূপ আসক্তি-শূন্য হৃদয়ই পৃথিবীর সকল প্রকার পাপের আধার। প্রকৃত ভালবাসা নিষ্কাম প্রবৃত্তি। সুখের বাসনা ইহাতে তিষ্টিতে পারে না, অভিমান ও স্বার্থ ইহাতে থাকিতে পারে না, ইহা এক প্রকার নিষ্কাম ধর্ম্মও বটে। সৎ প্রবৃত্তির এমন অধীনতা আর কিছুতেই দেখা যায় না; এত আত্ম-বিস্মৃতি, এত পরের চিন্তা আর কিছুতেই দেখা যায় না। ইহাতে সুখও অনন্ত। সুখ চাহিয়া কেহ ভালবাসে না, কিন্তু ভালবাসিলেই সুখ হয়। পদ্মা সুখের লাগিয়া হাহাকার করিত, সুখ পাইবার জন্য কত বিধ উপায় অবলম্বন করিত, কত কল্পনা করিত, কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভালবাসা জন্মে নাই, সে পর্য্যন্ত সে সুখে সম্পূর্ণ বঞ্চিত ছিল।

জীবনের মধ্যভাগে পদ্মার হৃদয়ে এ ভালবাসা অঙ্কুরিত হইল। সুখান্বেষণ করিয়া পদ্মা যখন দেখিতে পাইল যে সুখটা খুঁজিলে পাওয়া বড় দুষ্কর, সে একপ্রকার সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়া বসিল। একটু একটু সেলিমের মহিষী-পদ তখনও লোভনীয় হইল বটে, কিন্তু বিবিধ কারণে তাহা, দৈব ঘটনায়ই অন্তর্হিত হইতেছিল। পদ্মার হৃদয়ে যখন এইরূপে সুখ-সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইতে ছিল, তখন এক দিন পথ মধ্যে তাহার সহিত নবকুমারের সাক্ষাৎ হইল। নবকুমার রূপবান পুরুষও বটেন—বিশেষ পুরুষ জাতির সহিত রসালাপ করিতে, ও পুরুষ-হৃদয় জয় করিতে পদ্মাবতীর আশৈশবই উৎসাহ—পদ্মা তাই নবকুমারকে ধরিলেন। এ পর্য্যন্ত তিনি তাহাকে স্বামী বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। যখন সেই পরিচয় হইল, পদ্মার হৃদয়ের এক নূতন গতি হইল। বহুদিনের পরে সেই পতির সহিত সন্দর্শন—আবার পতি সপত্নী সহিত যুক্ত! অনেক দিন হইতেই অনাসক্তির দুঃখ বুঝিয়া পদ্মার অন্তঃকরণে আসক্তির একটা স্পৃহা জন্মিতে ছিল। কিন্তু পাত্র মিলিতেছিল না। যথেচ্ছা ইহা হওয়া অসম্ভব। যেখানে যথেচ্ছা ইহা হয়, সেখানে আমরা রূপের প্রভাব প্রভৃতি কতকগুলি কারণ দেখিতে পাই। আমরা যথেচ্ছা এইরূপ আসক্তির সঞ্চারে প্রায়ই প্রকৃত আসক্তি দেখিতে

পাই না। এই জন্য একটা বন্ধন চাই। একটা প্রতিজ্ঞা চাই। বিবাহ এইরূপ একটি বন্ধন। ইহাতে ভালবাসা জন্মাইয়া থাকে। এবং বিবাহের পর যে ভালবাসা জন্মে, তাহাই প্রকৃত ভালবাসা। যাহাদিগের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে অনুরাগ সঞ্চার হয়, তাঁহাদিগেরও প্রকৃত অনুরাগ বিবাহের পরই হইয়া থাকে। পূর্ব্বের অনুরাগ মোহ, ভালবাসা নহে। পুনঃ পুনঃ সম্ভোগে যখন সে মোহ অপসারিত হয়, তখন যে আসক্তি টুকু থাকে, তাহাই প্রকৃত। হিন্দুরা ইহা খুব বুঝিতেন। তাই হিন্দুর বিবাহ প্রণালী কিছু স্বতন্ত্র রকমের। যেরূপ মোহের কথা বলা হইল, তাহা প্রকৃত প্রণয়ের সহিত যুক্ত থাকিলে যে প্রণয়টি সর্ব্বাঙ্গীণ সুন্দর হয়, তাহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না; কিন্তু সে টুকুর জন্য অনেক সময়ে আমাদিগকে বড় বিপদগ্রস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। তাই হিন্দুর অনুরাগ বিবাহের পরে। আগে প্রতিজ্ঞা, শেষে ভালবাসা। সকল ভিন্ন কার্য্য হয় না। বিনা অভ্যাসে ভালবাসাকে কে স্থির ও স্থায়ী রাখিতে পারে? এ সকল কথা কিছু পদ্মা জ্ঞাতভাবে ভাবেন নাই; কিন্তু অজ্ঞাতে নিশ্চয়ই এই সকল কথা মুহূর্ত্তমধ্যে জড় হইয়া একটি রাসায়নিক পদার্থ নির্ম্মাণ করিল। সেই পদার্থের গুণে পদ্মা নবকুমারকে তাঁহার আসক্তির প্রকৃত পাত্র মনে করিলেন ও তৎপ্রতি আসক্ত হইলেন। ইহার অন্য কারণ জিজ্ঞাসা করিলে পদ্মাবতীর ন্যায় আমাদিগেরও উত্তর 'ললাট লিখন।'

এই আসক্তি সম্বন্ধে গ্রন্থকারের কয়েকগুলি কথা উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

"ক্ষেত্রে বীজ রোপিত হইলে আপনিই অঙ্কুর হয়। যখন অঙ্কুর হয়, তখন কেহ জানিতে পারে না—দেখিতে পায় না। কিন্তু একবার বীজ রোপিত হইলে, রোপণকারী যথায় থাকুক না কেন, ক্রমে অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ মস্তকোন্নত করিতে থাকে। অদ্য বৃক্ষটি অঙ্গুলি পরিমেয় মাত্র, কেহ দেখিয়াও দেখিতে পায় না। ক্রমে তিল তিল বৃদ্ধি। ক্রমে বৃক্ষটি অর্দ্ধ হস্ত, এক হস্ত, দুই হস্ত পরিমাণ হইল। আর, যদি তাহাতে কাহারও স্বার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনা না রহিল, তবে কেহ দেখে না, দেখিয়াও দেখে না। দিন যায়, মাস যায়, বৎসর যায়, ক্রমে তাহার উপর চক্ষু পড়ে। আর অমনোযোগের কথা নাই—ক্রমে বৃক্ষ বড় হয়, তাহার ছায়ায় অন্য বৃক্ষ নষ্ট করে—চাহি কি ক্ষেত্র অনন্যপাদপ হয়।

"লুৎফ-উন্নিসার প্রণয় এইরূপ বাড়িয়াছিল। প্রথম একদিন অকস্মাৎ প্রণয়ভাজনের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন প্রণয় সঞ্চার বিশেষ জানিতে পারিলেন না। কিন্তু তখনই অঙ্কুর হইয়া রহিল। তাহার পর আর সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু অসাক্ষাতে পুনঃ পুনঃ সেই মুখমণ্ডল মনে পড়িতে লাগিল, স্মৃতিপটে সে মুখমণ্ডল চিত্রিত করা কতক কতক সুখকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, বীজে অঙ্কুর জন্মিল। মূর্ত্তিপ্রতি অনুরাগ জন্মিল। চিত্তের ধর্ম্ম এই যে, যে মানসিক কর্ম্ম যত অধিক বার করা যায় সে কর্ম্মে তত অধিক প্রবৃত্তি হয়; সে কর্ম্ম ক্রমে স্বভাবসিদ্ধ হয়। লুৎফ-উন্নিসা সেই মূর্ত্তি অহরহঃ মনে ভাবিতে লাগিলেন। দারুণ দর্শনাভি-

লাব জন্মিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহজস্পৃহা-প্রবাহও দুর্নিবার্য্য হইয়া উঠিল। দিল্লীর সিংহাসনলালসাও তাহার নিকট লঘু হইল। সিংহাসন যেন মন্মথশরনস্তুত অগ্নিরাশি বেষ্টিত বোধ হইতে লাগিল। রাজ্য, রাজধানী, রাজসিংহাসন, সকল বিসর্জ্জন দিয়া পদ্মাবতী প্রিয়জন সন্দর্শনে ধাবিত হইলেন। সেই প্রিয়জন নবকুমার।

"এই জন্যই লুৎফ-উন্নিসা মেহের-উন্নিসার আশানাশিনী কথা শুনিয়াও অসুখী হয়েন নাই; এইজন্যই আগ্রায় আসিয়া সম্পদ রক্ষার কোন যত্ন পাইলেন না; এইজন্যই জন্মের মত বাদসাহের নিকট বিদায় লইলেন।"

কথাটি বেশ পরিষ্কার হইয়া পড়িল।

এই নবকুমারের প্রতি আসক্তির প্রাবল্যের সঙ্গে সঙ্গে আবার পদ্মায় সেই একটানা ভাব উপস্থিত হইল। এখন নবকুমারকে পাইবার ইচ্ছাই তাহার এক মাত্র ইচ্ছা। ইহার সহিত অন্য কিছু বিরোধ হইল না। নবকুমারের সহিত পুনঃ সাক্ষাতে এ দুর্জ্জয় স্রোতের ভাব আমরা নিরীক্ষণ করিলাম।

একদিন এক সজ্জিত কক্ষায় লুৎফ-উন্নিসা বসিয়া রহিয়াছেন। পৃথগাসনে নবকুমার উপবিষ্ট আছেন। কিছুক্ষণ নীরবে অতিবাহিত করিয়া নবকুমার কহিলেন, 'তবে এক্ষণে আমি চলিলাম। তুমি আর আমাকে ডাকিও না।' লুৎফ উন্নিসা কহিলেন যাইও না। আর একটু থাক। আমার যাহা বক্তব্য তাহা সমাপ্ত করি নাই।' নবকুমার আরও ক্ষণেক প্রতীক্ষা করিলেন, কিন্তু লুৎফ-উন্নিসা কিছু বলিলেন না। ক্ষণেক পরে নবকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আর কি বলিবে?' লুৎফউন্নিসা কোন উত্তর করিলেন না—তিনি নীরবে রোদন করিতেছিলেন।

নবকুমার ইহা দেখিয়া গাত্রোত্থান করিলেন, লুৎফ-উন্নিসা তাহার বস্ত্রাগ্র ধৃত কহিলেন। নবকুমার ঈষৎ বিরক্ত হইয়া করিলেন, 'কি বল না?' লুৎফ-উন্নিসা কহিলেন, 'তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছু কি প্রার্থনীয় নাই? ধন, সম্পদ, মান প্রণয় রঙ্গ, রহস্য, পৃথিবীতে যাহাকে সুখ বলে, সকল দিব কিছুই তাহার প্রতিদানে চাহি না কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব এ গৌরবও চাহি না, কেবল দাসী। নবকুমার কহিলেন 'আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহ জন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিব। তোমার দত্ত ধন সম্পদ লইয়া যবনীজার হইতে পারিব না। লুৎফ-উন্নিসা অধোবদনে রহিলেন। নবকুমার তাহার হস্ত হইতে বস্ত্রাগ্রভাগ মুক্ত করিলেন। লুৎফ-উন্নিসা আবার তাহার বস্ত্রাগ্র ধরিয়া কহিলেন 'ভাল সে যাউক বিধাতার যদি সেই ইচ্ছা, তবে চিত্তবৃত্তি সকল অতল জলে ডুবাইব। আর কিছু চাহি না, এক একবার তুমি এই পথে যাইও; দাসী ভাবিয়া দেখা দিও, কেবল চক্ষু পরিতৃপ্ত করিব।'

অধিক উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন নাই। যে পদ্মাবতী একদিন দিল্লীর সিংহাসন-প্রার্থিনী হইয়াছিল, সেই আজি নবকুমার দাসী হইতে চলিল! যে এতদিন ইন্দ্রিয় সুখকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুখ মনে করিত, সে আজি কেবল নবকুমারকে দেখিবার জন্য তাহা পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইল।

প্রণয়ের এইরূপই আধিপত্য বটে। পদ্মাবতীর প্রণয়ের খরস্রোতে অন্য সব ভাসিয়া গেল।

ইহার পরে পদ্মাবতী যাহা করিল, এই মনোবৃত্তি লইয়াই। তাহার উল্লেখে প্রয়োজন নাই।

পদ্মাবতী আদিতে যেরূপ দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তি স্রোতে ভাসিতে ছিল, এখনও সেইরূপ ভাসিতে লাগিল। তবে, পার্থক্য এত খানি যে, পূর্ব্বের প্রবৃত্তি পঙ্কিল ছিল, শেষের প্রবৃত্তি প্রায় নির্ম্মল। 'প্রায়' বলিলাম এই জন্য যে এখনও পদ্মাবতী পাপের হস্ত হইতে সম্যক্ মুক্ত হইতে পারে নাই। নবকুমার তাহার স্বামী, নতুবা এখনও তাহাকে প্রণয়াসক্তা বেশ্যা বলা যাইতে পারে। নবকুমারের সহিত সে যেরূপ ভাবে কথা কহিল, কপালকুণ্ডলার সহিত সে যেরূপ ব্যবহার করিল, তাহাতে সে উচ্চ শ্রেণীর বারনারী ভিন্ন অন্য আখ্যা পাইবার যোগ্যা নহে। তবে পূর্ব্ব প্রকৃতি ভাবিয়া দেখিলে, সে সংশোধনের পথে আসিয়াছে, ইহাও বলা যায়। পূর্ব্বে অন্তঃকরণে অনুরাগ ছিল না; এখন অনুরাগ হইল এবং সেই অনুরাগ স্বামীর প্রতি—তাই ভরসা করি, পদ্মাবতী কালে সংশোধিতা হইয়াছিল। এতদতিরিক্ত কিছু বলা যায় কি? প্রকৃত প্রণয়ের অভাব ও সদ্ভাবেই এই পার্থক্য জন্মাইল। পদ্মাবতী কিন্তু আগা গোড়া একভাবে ঐক্য রহিল—পদ্মাবতীর চিত্র বঙ্কিম বাবুর কম কীর্ত্তিস্তম্ভ নহে।

৩। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিতাবলী।

১। নবকুমার।—কবি নবকুমারকে কয়েকটি বিশিষ্ট গুণে বিভূষিত করিয়া কপালকুণ্ডলার যোগ্য প্রণয়পাত্র করিয়া গ্রন্থমধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন। নবকুমার পরোপকারী—পরের জন্য স্বীয় জীবন ভয় তুচ্ছ করিয়া কাষ্ঠ আহরণ করিতে, অপরিচিত ব্যাঘ্রাদিসঙ্কুল অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন। নবকুমার ধীর প্রকৃতি, সাহসী, অধ্যবসায়ী—'যে কর্ম্মে তিনি প্রবৃত্ত হয়েন, তাহাতে অল্পে ক্ষান্ত হওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল না।' নবকুমার ভাবুক সহৃদয়—সমুদ্রদর্শন মানসে দস্যুভয় সঙ্কুল নদীপথে গঙ্গাসাগর গমন করিয়াছিলেন—আবার যখন তিনি সমুদ্র তটে ভয়ানক বিপন্নাবস্থায় পতিত হয়েন, তখনও জলধিশোভা তাঁহাকে আত্মবিস্মৃতিময় করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নবকুমার শাস্ত্রজ্ঞ, জ্ঞানী। নবকুমার বলবান—কাপালিকের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য তিনি সমধিক বলপ্রকাশ করিয়াছিলেন। নবকুমার প্রণয়ী—কপালকুণ্ডলার প্রতি তাঁহার আসক্তি গ্রন্থমধ্যে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। নবকুমারের সেই সন্দেহের অন্তর্দাহে, কপালকুণ্ডলাকে এজন্য কিছু না বলিয়া নিজের প্রাণ-সংহারে কৃতসঙ্কল্প হওয়ায়, সেই কাপালিকের সহিত শেষ বারের সন্দর্শনে প্রথম হর্ষোদয়ে, পরে ভয়শূন্যাবস্থায় আত্মসমর্পণে, আর তাঁহার অন্তিমের সেই উচ্ছ্বসিত সরল বাক্যাবলিতে, আত্মত্যাগে, এ আসক্তি অতি সুন্দর, অতি মধুর ভাবে, পাঠকবর্গকে বুঝাইয়া দিতেছে। কপাল-

কুণ্ডলাকে বলি দিতে প্রস্তুত হওয়ায় নবকুমারের নির্দ্দয়তা প্রতীত হয়, কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে তাহাতে নবকুমারের কিছু মাত্র অপরাধ নাই। নবকুমার যাহা দেখিয়া যাহা বিশ্বাস করিলেন, তাহাতে তাঁহার জ্ঞান বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। সেই সময়ে আবার দুরন্ত কাপালিক কত কথা বলিয়া, ভৈরবীর আজ্ঞা বলিয়া নবকুমারকে উক্ত নিষ্ঠুর কার্য্যে প্ররোচনা জন্মাইতে লাগিল। শুদ্ধ ইহাই কি যথেষ্ট নহে? কিন্তু ইহার উপরও আর কিছু হইয়াছিল। কাপালিক কৌশলে নবকুমারকে সুরাপান করাইয়া দিয়াছিল—নবকুমারের সেই প্রথম সুরাপান—ইহাতে কি জ্ঞান থাকিবার কথা? এ কার্য্যে নবকুমার অপরাধী নহে। নবকুমারের প্রণয়ে কিছু মাত্র পঙ্কিলতা ছিল না।

নবকুমার ধার্ম্মিক, চিত্তজয়ী—অমন পদ্মাবতীকে তিনি অনায়াসে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুরুষের আর কি চাই বল? কিন্তু তবু কপালকুণ্ডলা এহেন নবকুমারকে লইয়া সুখী হইতে পারিলেন না। হাজার হউক নবকুমার সামাজিক জীব। কপালকুণ্ডলা সমাজ চিনিতেন না। বিবাহ প্রভৃতি সমাজ-বন্ধনের সূত্রও তিনি ভাল বুঝিতেন না। কপালকুণ্ডলার অপরিবর্ত্তিত বা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত মৌলিক প্রকৃতি নবকুমারের সামাজিক প্রকৃতির সহিত মিশিতে পারিল না। একেবারেই কি পারিল না? তাহা নহে। তোমরা আমরা যাহাকে মিশা বলি, তাহা ঘটিল না। কপালকুণ্ডলা সামাজিক পত্নী হইয়া থাকিতে পারিল না।

২। শ্যামাসুন্দরী।—যেমন একদিকে পদ্মাবতী, তেমন অন্যদিকে শ্যামাসুন্দরীও কপালকুণ্ডলার স্বরূপ পরিচয় প্রদান করিয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য বিস্তার করিতেছেন। পদ্মাবতী সংসারের পঙ্কিল কীট, কপালকুণ্ডলা অরণ্যের পবিত্র প্রসূন। পদ্মাবতী শুদ্ধ অদৃষ্টবাদ বুঝাইতেই কপালকুণ্ডলার সহচারিণী (duplicate) নহে, পদ্মাবতী কপালকুণ্ডলার পরোপচিকীর্ষা, সরলতা ও সর্ব্বোপরি পবিত্রতাও প্রদর্শন করিতেছে। কপালকুণ্ডলা নিজে প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াও অপরিচিত নবকুমারের প্রাণ রক্ষা করিল, পদ্মাবতী স্বীয় প্রণয়ভাজন, উপকারী বান্ধব সেলিমকে রাজ্যচ্যুত করিতে চেষ্টা করিল—নিজের সুখের জন্য অমন কপালকুণ্ডলাকেও স্বামীত্যাগ করাইতে প্রস্তুত হইল! যেরূপ পদ্মাবতী, ঠিক সেইরূপ না হউক, শ্যামাসুন্দরীও কপালকুণ্ডলার সহচারিণী (duplicate)। পাঠক এক বার সেই শ্যামাসুন্দরী ও কপালকুণ্ডলার কথোপকথোন স্মরণ করুন—একদিকে কুলীনপত্নী স্বামীবিরহিনী শ্যামাসুন্দরী, স্বামীসোহাগের জন্য কতই না চেষ্টা করিতেছে, অন্যদিকে তাহারই কাছে বসিয়া কপালকুণ্ডলা অমন দেবদুর্লভ স্বামী নবকুমারের অমন আত্মরক্তি অবাধে অগ্রাহ্য করিতেছে। এক দিকে শ্যামাসুন্দরী সংসারের সমস্ত সুখগুলি নিজে মুগ্ধচিত্তে দেখিয়া কপালকুণ্ডলাকে দেখাইতেছে ও দেখিয়া মুগ্ধ হইতে বলিতেছে, অন্য দিকে কপালকুণ্ডলা সংসারের কিছুতেই সুখ না দেখিয়া সেই বনে বেড়াইবার সাধ প্রকাশ করিতেছে।

কি সুন্দর যুগল চরিত্র! কপালকুণ্ডলাকে শ্যামাসুন্দরীর কাছে আনিয়া বঙ্কিমবাবু তাহাকে যেন সমাজের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করাইয়া দিয়াছেন—দিয়া দেখাইয়াছেন যে, ইহাতেও কপালকুণ্ডলার বাল্যশিক্ষা পরিবর্ত্তিতা হইল না। শ্যামাসুন্দরী ও পদ্মাবতী সংসারের উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট এই দুই ভাগের দুইটি ছবি। সংসার ছাড়া কপালকুণ্ডলার সহিত ইহারা উভয়েই তুলনীয়।

আবার পদ্মাবতীর যেমন একটি স্বতন্ত্র জীবন আছে, শ্যামাসুন্দরীরও সেইরূপ একটি স্বতন্ত্র জীবন আছে। অর্থাৎ কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইতে কবি ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকিলেও, ইহাদের চরিত্রে সে ভাগ ছাড়া আরও কিছু আছে। পদ্মাবতীর কথা বিস্তৃত, তাহা বিস্তৃত ভাবে বলাও হইয়াছে; শ্যামা সুন্দরীর কথা সঙ্ক্ষিপ্ত, তাহাই এই স্থলে বলিব।

শ্যামাসুন্দরীর এই সংক্ষিপ্ত বিবরণটি অর্থাৎ চিত্রের রেখাপাতগুলি বড়ই সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। যেমন সঙ্গীতে বিভিন্ন রাগ রাগিণীর বিভিন্ন 'বাদী' (জান) থাকে, সেই ভাগটা জানা থাকিলেই, বাকী ভাগটা অনায়াসে সাধিত হইতে পারে, ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রেরও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন 'জান' থাকে, চরিত্রের সেই ভাগটা জানিতে পারিলেই, অন্য ভাগটা সহজেই জানা যায়। শ্যামাসুন্দরীর চরিত্রের এই জওভাগটি (জান) কবি খুলিয়া দেখাইয়াছেন—তাই শ্যামাসুন্দরীর চিত্রে রেখাপাত মাত্র হইয়া থাকিলেও, চিত্রটি সম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। কথাটি ক্রমে খুলিয়া বলিতেছি।

কপালকুণ্ডলার 'অবরোধে' নামক অধ্যায়ে শ্যামসুন্দরীর সহিত আমাদিগের প্রথম সাক্ষাৎ।

"শ্যামাসুন্দরী মৃণ্ময়ীর নিকটে একটি শৈশবাভ্যস্ত কবিতা বলিতেছিলেন, যথা—

বলে—পদ্মরাণী, বদনখানি, রেতে রাখে ঢেকে।
ফুটায় কলি, ছুটায় অলি, প্রাণপতিকে দেখে॥
আবার—বনের লতা, ছড়িয়ে পাতা, গাছের দিকে ধায়
নদীর জল, নামলে ঢল, সাগরেতে যায়॥
ছিছি—শরম টুটে, কুমুদ ফুটে, চাঁদের আলো পেলে
বিয়ের কনে রাখ্‌তে নারি ফুলশয্যা গেলে॥
মরি—একি জ্বালা, বিধির খেলা, হরিষে বিষাদ।
পরপরশে সবাই রসে, ভাঙ্গে লাজের বাঁধ॥

তুই কিলো একা তপস্বিনী থাকিবি?"

মৃণ্ময়ী উত্তর করিল 'কেন, কি তপস্যা করিতেছি?'

(ইহার পরভাগ সমস্তই আমরা অন্য স্থানে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি, পাঠকবর্গ অনুগ্রহ করিয়া পাতা কয়েকটা উল্টাইয়া সেই স্থানটি একবার পড়িয়া লইবেন।) ইহার পর আর এক দিন মাত্র শ্যামাসুন্দরীকে আমরা দেখিয়াছি। সেদিন শ্যামাসুন্দরী ও কপালকুণ্ডলা নিম্নলিখিত কথোপকথন করিতেছেন।

"কপালকুণ্ডলা কহিলেন, 'ঠাকুরজামাই আর কতদিন এখানে থাকিবেন?' শ্যামা কহিলেন, 'কালি বিকালে চলিয়া যাইবে। আহা! আজি রাতে যদি ঔষধটি তুলিয়া রাখিতাম, তবু তারে বশ করিয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করিতে পারিতাম। কালি রাত্রে বাহির হইয়াছিলাম, বলিয়া নাথি ঝাঁটা খাইলাম, আর আজি বাহির হইব কি প্রকারে?'

ইত্যাদি—সমস্ত উদ্ধৃত করা নিষ্প্রয়োজন।

এই অধ্যায় দুইটী, বিশেষতঃ প্রথমটি

পড়িয়া আমরা যেন দেখিতে পাইতেছি শ্যামাসুন্দরী মূর্ত্তিমতী হইয়া আমাদিগের সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন। মুখখানি মধুর আনন্দে ভরা—হৃদয়খানি সংযত প্রেমলালসায় পরিপূর্ণ। শ্যামাসুন্দরী যুবতী—সংসার যেন এখন তাঁহার নিকট সুখের সামগ্রীগুলিকে সুবর্ণবর্ণে বিভাসিত করিয়া একখানি চিত্রপটে আঁকিয়া সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছে। সেই সামগ্রীগুলি শ্যামাসুন্দরীর বড়ই প্রীতিকর—তাহা পাইবার জন্য শ্যামাসুন্দরী বড়ই লালায়িত। কিন্তু সে সামগ্রীগুলি কিছু দূরে—শ্যামাসুন্দরীর পক্ষে তাহা সহজ-প্রাপ্য নহে, তাই শ্যামাসুন্দরী হর্ষ বিষাদে মিশ্রিত মনোভাব লইয়া তদ্দিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। সুখ—জিনিসগুলি দেখিয়া, তাহার মনোহারীত্ব কল্পনা করিয়া; দুঃখ—তাহার অপ্রাপ্যতা বা কষ্টপ্রাপ্যতা নিবন্ধন। সম্মুখে কপালকুণ্ডলা বসিয়া রহিয়াছেন—শ্যামাসুন্দরী সেই চিত্রপট খানির সৌন্দর্য্য তাহার নিকট ব্যাখ্যা করিতেছেন। কপালকুণ্ডলা কিছুই বুঝিতেছে না—শ্যামাসুন্দরী তাহাকে বুঝাইবার জন্য কত চেষ্টা করিতেছেন—চিত্রপটের রঙগুলি সহস্রগুণে স্ফুট করিয়া কপালকুণ্ডলাকে দেখাইতেছেন ও সে বুঝিতেছে না বলিয়া বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইতেছেন। আমার অতি প্রিয় দুর্লভ দ্রব্যকে যে ব্যক্তি সহজে পাইতে পারে, সে যদি তাহা পাইবার চেষ্টা না করে, তবে যেমন আমার মনে ক্ষোভ হয়, শ্যামাসুন্দরীর তাহাই হইতেছিল। যাহা তাঁহার চক্ষে অত প্রীতিকর, কপালকুণ্ডলা তাহা সহজেই পাইতে পারেন। কিন্তু কপালকুণ্ডলা তাহা চাহিতেছে না। হায়! শ্যামাসুন্দরীর যদি ঐরূপ হইত, তবে না জানি তিনি কত সুখী হইতে পারিতেন, এইরূপ একটা কথা তাঁহার মনের মধ্যে অজ্ঞাতসারে ক্রীড়া করিতেছে।

পাঠক, স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয় পরমিলনদর্শনেচ্ছু বিরহিণী শ্যামাসুন্দরীর মূর্ত্তিটি সুন্দর নয় কি? শ্যামা কুলীনপত্নী—স্বামী সোহাগে প্রায়ই বঞ্চিত। অথচ স্বামীসোহাগ যে কি পদার্থ, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন। বিরহের সুশীতল ছায়ায়, কল্পনার বারিসেকে, সে ভাবটি ধীরে ধীরে পরিপুষ্ট হইয়া লতার ন্যায় এখন তাহা সমগ্র শ্যামাসুন্দরীকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। শ্যামাসুন্দরী এখন সেই লতাভারে অবনতা। সম্মুখে কপালকুণ্ডলাকে সেই স্বামীসোহাগের মর্য্যাদা বুঝাইয়া দিতেছেন। সংসারের সুখগুলি তাঁহাকে বলিয়া দিতেছেন—সংসার চিনিলেই কপালকুণ্ডলা স্বামী চিনিবে। যাহাতে কপালকুণ্ডলা নবকুমারের সহিত মিলিতা হয়, শ্যামাসুন্দরীর এখন কেবল সেই চেষ্টা। বিরহিণীগণ অপরের মিলন দেখিয়া দীর্ঘশ্বাসের সহিত একরূপ মৃদু মধুর আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। কপালকুণ্ডলা গম্ভীরা প্রকৃতি—স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য তাহার কোন চেষ্টা নাই। দেখিয়া শ্যামাসুন্দরী কিছু বিস্মিত—শ্যামাসুন্দরী ভাবিতেছেন—তাও কি হয়, স্ত্রী কি স্বামীর মন তুষ্ট করিতে যত্নবতী না হইয়া থাকিতে পারে? কপালকুণ্ডলাও তবে যত্ন করে। যদি তাহা গোপনে করে? তাই শ্যামাসুন্দরী উদ্বিগ্ন হৈয়া

পারিতে পড়িতে তাঁহার ভাবিতেছিলেন ও কপালকুণ্ডলাকে তাহাই ইঙ্গিতে বলিতেছিলেন। কপালকুণ্ডলাকে যখন কিছুতেই আপন মতে আনিতে পারিলেন না—আপনার মত প্রেমোন্মাদিনী করিতে পারিলেন না, তখন শ্যামাসুন্দরী তাঁহার কল্পনার স্বপ্নে দুই সংসারের চিত্রপটখানি, তাহার সম্মুখে ধরিলেন। বলিলেন 'বাঁধাব ক্লাপন বাপ', ইত্যাদি। শ্যামাসুন্দরীর নিকটে ইহাই স্বর্গসুখ—স্তরে স্তরে কাব্যময় বর্ণনা উপরে উঠিতে লাগিল। শ্যামাসুন্দরী বলিলেন, সোণার পুত্তলি ছেলে, কোলে তোর দিব ফেলে, দেখি ভাল লাগে কিনা লাগে।" কথাটি শ্যামাসুন্দরীর আকাঙ্ক্ষার কথা—তাঁহার সুখের চরমোৎকর্ষের কথা। কি সুন্দর—কি স্বাভাবিক! ইহাই রমণীর কথা! শ্যামাসুন্দরী কথাটি বলিয়া অবাক্ হইয়া না জানি কি সুন্দর ভাবেই কপালকুণ্ডলার দিকে চাহিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আনন্দের সহিত শ্যামাসুন্দরীর একটু দুঃখের ভাবও মিশ্রিত ছিল। উভয়ের মিশ্রণে যেরূপ হর্ষ ভাবটি সঞ্জাত হয়, গ্রন্থকার তাহা প্রথমে আমাদিগকে দেখাইলেন—শেষে যখন মৃণ্ময়ী বলিল—(ফুল ফুটিলে) 'লোকের দেখে সুখ, ফুলের কি?' কবি আমাদিগকে সেই হর্ষবিষাদ মিশ্রণে যে দুঃখ ভাবটি সঞ্জাত হয় তাহাও দেখাইলেন। পূর্ব্বে দুঃখ সুখ দেখিয়াছি—এখন সুখমিশ্রিত দুঃখ দেখিলাম। কুলীনপত্নী হিন্দুরমণী শ্যামা ফুটিয়া নিজে সুখী হইতে পারেন নাই সত্য, কিন্তু পাঠকবর্গকে সুখী করিয়াছেন। মৃণ্ময়ীর কথাটিই স্থির হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়ে আমরা শ্যামাসুন্দরীকে যেরূপ দেখিয়াছি, শেষ অধ্যায়ে ঠিক সেইরূপ দেখিতে পাইলাম না। প্রথম অধ্যায়ে শ্যামাসুন্দরী নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার মিলন ও সুখ দেখিবার জন্য লালায়িত—শেষ অধ্যায়ে শ্যামাসুন্দরী নিজের সুখের জন্য উৎকণ্ঠিত। স্ত্রীলোকের স্বামীই সর্ব্বস্ব। সেই স্বামিপ্রাপ্তির জন্য সে সব করিতে পারে। শ্যামাসুন্দরীর অমন নির্ম্মল হৃদয়েও স্বামীর কথায় একটু মলিনতা পড়িল। সেই মলিনতাও বড়ই স্বাভাবিক ও বড়ই শ্যামাসুন্দরীর মত। অন্য কপালকুণ্ডলাকে নবকুমারের অসন্তোষভাজন করিয়াও স্বামীবশীকরণের ঔষধসংগ্রহে কপালকুণ্ডলাকে বনমধ্যে প্রেরণ করিতে মনে মনে প্রস্তুত। প্রকাশ্যে নিষেধ করিতেছেন—কিন্তু মনের অভিলাষ অন্যরূপ। অমন স্বামীসোহাগলালসা-পূর্ণ শ্যামাসুন্দরীর হৃদয় ত এইরূপই হইবে।

তবেই আমরা নির্ব্বিবাদে বলিতে পারি, শ্যামাসুন্দরী সঙ্গীতের প্রাণ—বিরহিণীর মিলন-পিপাসায় অপরিতৃপ্তি জনিত দীর্ঘশ্বাস, অন্য দম্পতি-মিলনদর্শন লালসা—যুবতী হৃদয়ে স্বাভাবিক আনন্দে আত্মবিস্মৃতি ও রসপ্রবণতা—সংসারীর অনাস্বাদিত সংসার সুখের আকাঙ্ক্ষা ও তৎপ্রতি কল্পনার মোহময় মধুর দৃষ্টি। সে সঙ্গীতের এইরূপ প্রাণ, তাহা বলুন নয় কি?

৩। অধিকারী!—বঙ্কিম বাবুর প্রায় উপন্যাসেই এইরূপ এক একটি চরিত্র, কামনা-বিশেষে প্রস্তুত, চরিত্র বিশেষের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বর্ত্তমান থাকে।

দুর্গেশনন্দিনীর অভিরামস্বামী, মৃণালিনীর মাধবাচার্য্য, চন্দ্রশেখরের রমানন্দস্বামী, আনন্দমঠের সন্ন্যাসী সত্যানন্দের গুরু, দেবী-চৌধুরাণীর ভবানী পাঠক ও সীতারামের চন্দ্রচূড় অল্পাধিক পরিমাণে আমাদিগের দৃষ্টান্ত স্থল। স্থানান্তরে আমরা এতৎসম্বন্ধে যাহা বলিবার বলিব। এখন এই সাদৃশ্য দেখাইয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

৪। কাপালিক।—কপালকুণ্ডলার কোমলতা সমীচীন স্ফুটিত করিবার জন্য দুরন্ত কাপালিক কল্পিত হইয়াছে। করাল কাদম্বিনী পার্শ্বে বিদ্যুতের বিকাশ যেরূপ মনোহর, দুর্দ্দান্ত কাপালিকের পার্শ্বে দয়াময়ী কপালকুণ্ডলাও তদ্রূপই মনোহর। পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধ গুণ বিশিষ্ট—কিন্তু উভয়ের সংস্থান আবার একস্থলে। ইহাই জগতের নিয়ম। যেখানে নির্দ্দয়তার নিষ্ঠুর অত্যাচার প্রকাশিত,—সেই খানেই আবার দয়ার সুকোমল হস্তও প্রসারিত।

৫। ভাষা-বর্ণনা-ইত্যাদি।

ভাষা।—'কপালকুণ্ডলা'র ভাষায় কিছু শব্দাড়ম্বর ও সমাসচ্ছটা পরিলক্ষিত হয়। শেষের উপন্যাসগুলির ন্যায় ইহা প্রাঞ্জল নহে। এ সম্বন্ধে অন্য কথা অন্যত্র বলা হইবে।

বর্ণনা।—কপালকুণ্ডলার বর্ণনাগুলি অতি পরিপাটি। এই বর্ণনা গুলির আর একটি বিশেষ গুণ এই যে, মানব-প্রকৃতির সঙ্গে ইহা অতি সুন্দররূপে মিশিয়া রহিয়াছে। জড়প্রকৃতি ও মনোপ্রকৃতির এইরূপ সুন্দর সঙ্গত কাব্যে অতীব প্রীতিকর ও আনন্দদায়ক। বঙ্কিম বাবুর অন্যান্য সমস্ত উপন্যাস অপেক্ষাই 'কপালকুণ্ডলা' এ অংশে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। অনেকে এ জন্যও কপালকুণ্ডলাকে বঙ্কিম বাবুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিয়া থাকেন। আমরা নিম্নে ইহার কয়েকটি বর্ণনা পাঠক-বর্গকে উদ্ধৃত করিয়া তাহা ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিব।

নবকুমারের সঙ্গিগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বাটী প্রত্যাগমন করিয়াছেন। নবকুমার সেই লোকালয়শূন্য বালুকাস্তূপশ্রেণী মধ্যে বসিয়া একাকী। ক্ষুধায় তৃষ্ণায়, তাঁহার জঠর জ্বলিতেছিল, কিন্তু সে কষ্ট দূর করিবার কোনই সম্ভাবনা ছিল না। "দুরন্ত শীতনিবারণের জন্য আশ্রয় নাই, গাত্র বস্ত্র পর্য্যন্ত নাই। এই তুষার-শীতল বায়ু-সঞ্চারিত-নদী-তীরে হিমবর্ষী আকাশতলে নিরাশ্রয়ে নিরাবরণে শয়ন করিয়া থাকিতে হইবে। হয়ত রাত্রিকালে ব্যাঘ্র ভল্লুকে, প্রাণনাশ করিবে। অদ্য না করে কল্য করিবে। প্রাণনাশই নিশ্চিত। এইরূপ চিন্তাকুল হইয়া মনের চাঞ্চল্য-হেতু নবকুমার একস্থানে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। তীর ত্যাগ করিয়া উপরে উঠিলেন। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল, যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিয়া থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্ব্বত্র জনহীন;—আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্ব্বত্র নীরব, কেবল অবিরলকল্লোলিত সমুদ্রগর্জ্জন, আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব।"

কি অপূর্ব্ব দৃশ্যপটই প্রস্তুত হইল।

নৃসাক্ষী যেন নবকুমারের অবস্থার সহিত—নবকুমারের চিন্তার সহিত এক সুরে বাঁধা। ইহাতে যেন সহজেই পাঠকের মানসপটে সমুদিত করা যায়, কিন্তু "শিশিরাকাশে নক্ষত্রগুলী নীরবে ফুটিতে লাগিল; যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল"—ইহা বুঝান আমাদিগের সাধ্যাতীত। কথাগুলি যেন ঠিক সেই আকাশের নক্ষত্রাবলীর ন্যায় নীরবে এই বর্ণনামধ্যে ফুটিয়া রহিয়াছে। ইহার কোন কথা ব্যাখ্যা করিব? 'শিশিরাকাশে' 'নীরবে'? না, 'ফুটিতে'? ইহার কোন ভাব ব্যাখ্যা করিব? সেই-রূপ সমুদ্রতীরস্থ নির্জ্জনপরিত্যক্ত আশা-শূন্য নবকুমারের নিকট সেই শূন্য প্রদেশের নীরবের নক্ষত্রোদয়? না, সেই নক্ষত্রোদয় দেখিয়া নবকুমারের সেই চিরপরিচিত স্বদেশের নক্ষত্রোদয়ের নীরব স্মৃতি—সেই "যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে; তেমনি ফুটিতে লাগিল?" ইহার ব্যাখ্যা? ভাষের ব্যাখ্যা করিব, না সেই ভাব-প্রকাশের অপূর্ব্বশক্তি ব্যাখ্যা করিব?—আমরা কিছুই করিব না—কিছুই করিতে পারিব না। এ সঙ্গীত আমরা গাহিতে অক্ষম—তাই কেবলমাত্র সঙ্গীতটির স্বরলিপি লিখিয়াই ক্ষান্ত হইলাম। যাঁহারা আমাদিগেরই মতন গাহিতে না জানেন, তাঁহারা সুচমধুর নিনাদে সেতারঝঙ্কারবৎ এ সঙ্গীতের ধ্বনি মানসপটে উত্থিত করিয়া সুখানুভব করুন আর যদি কেহ এ সঙ্গীত গাহিতে জানেন, গলা ছাড়িয়া মধুর ভৈরবে ইহার সুস্বরবাণি একরূপ আকাশের দিগন্তে ভাসাইতে পারেন, তাঁহারা সাধ পুরাইয়া তাঁহার সঙ্গীত-সুধার সার্থকতা লাভ করুন;—আমরা দূর হইতে অনন্তকার্য্য—অনন্যমনা হইয়া তাহা শ্রবণ করি; শুনিয়া শুনিয়া সংসারতাপে জর্জ্জরিত এ শ্রান্ত হৃদয়খানিকে একবার সেই নবকুমারের মত তন্দ্রাভিভূত করি। হায়, ইহা কি কেহ গাহিবে না?

২। নবকুমার ফলমূলান্বেষণে এক নিবিড় বনমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, পথ চিনিয়া ফিরিয়া যাইতে পারিতেছেন না। এমন সময়ে,

"গম্ভীর জলকল্লোল তাঁহার কর্ণমধ্যে প্রবেশ করিল, তিনি বুঝিলেন যে এ সাগর-গর্জ্জন! ক্ষণকাল পরে অকস্মাৎ বনমধ্যে বহির্গত হইয়া দেখিলেন যে, সম্মুখেই সমুদ্র। অনন্তবিস্তার নীলাম্বুমণ্ডল সম্মুখে দেখিয়া উৎকটানন্দে হৃদয় পরিপ্লুত হইল। সিকতাময় তটে গিয়া উপবেশন করিলেন। ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র, উভয় পার্শ্বে যতদূর চক্ষুঃ যায়, ততদূর পর্য্যন্ত তরঙ্গভঙ্গ-প্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপকৃত বিমল কুসুমদাম গ্রথিত মালার ন্যায়; সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীলজল-মণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গ-ভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখন এমত প্রচণ্ড বায়ু বহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে থাকে, তবেই সে সাগর-তরঙ্গ-ক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীল জলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল। অতি দূরে কোন ইউ-

পোর্টুগীস বণিক্ জাতির সমুদ্রপোত শ্বেত পক্ষ বিস্তার করিয়া বৃহৎ পক্ষীর ন্যায় জলধি-হৃদয়ে উড়িতেছিল। কতক্ষণ যে নবকুমার তীরে বসিয়া অনন্যমনে জলধি-শোভা দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, তদ্বিষয়ে তিনি তৎকালে পরিমাণ-বোধরহিত। পরে একেবারে প্রদোষতিমির আসিয়া কাল জলের উপর বসিল। তখন নবকুমারের চেতনা হইল যে, আশ্রম সন্ধান করিতে হইবে। তিনি দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। * * গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন—"অপূর্ব্ব মূর্ত্তি! সেই গম্ভীরনাদী বারিধি-তীরে সৈকত ভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব্ব রমণীমূর্ত্তি! কেশভার—অবেণীসম্বদ্ধ সংসর্পিত, রাশীকৃত আগুল্ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্য্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচন, কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ম্ময়; সে কটাক্ষ সাগর হৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল।"

মনোহর দৃশ্যপট! এ মনোহর আমরা সেই সাগর বর্ণনা, সেই সাগরতীরস্থ সুন্দরী, বলেন সেই রূপের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি—ইহার কিছুই বর্ণনা না। আমরা বলিব সেই গম্ভীরনাদী সাগরতীরে সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দণ্ডায়মান কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তির সহিত নবকুমারের তাৎকালিক হৃদয়ের সেই অপূর্ব্ব স্বপ্নের কথা—সেই অপূর্ব্ব সুখস্বপ্নের কথা। অনন্তবিস্তৃতা নীলবসনা বারিধি দেখিয়া নবকুমারের কাব্যময় হৃদয় স্বতঃই একরূপ অস্পষ্ট অজ্ঞাতচরিত্র সুখের মৃদু হিল্লোলে প্রবাহিত হইতেছিল। সেই সন্ধ্যালোকের ন্যায় সেই আধভাঙা অস্পষ্ট সুখ-স্বপ্ন লইয়া যখন নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে সম্মুখে দেখিলেন—স্বপ্ন পূর্ণ হইল, অস্পষ্ট স্পষ্ট হইল। সে সুখের সহিত এ সুখ যেন বিনা ওজরে মিশিয়া গেল। কম্পিত উর্ম্মিরাশি-বিক্ষুব্ধ সলিলরাশি যেরূপ উপলোৎক্ষেপণে মিশাইয়া যায়, নবকুমারের সেই সমুদ্র-দর্শনজনিত মনোভাব যেন কপালকুণ্ডলার প্রত্যক্ষজনিত চিত্তভাবের সহিত মিশাইয়া গেল। নবকুমার এক সমুদ্র পশ্চাৎ করিয়া দাঁড়াইলেন—আর এক সমুদ্র সম্মুখে উপস্থিত হইল। সেই তেমনই শোভাযুক্ত তেমনই চিত্তমোহকারী, তেমনই চিত্তভাব-বিশেষী।

ঐ। কপালকুণ্ডলা ক্লান্তির অন্ত জানিতে বনমধ্যে গমন করিতেছেন—উপরে চন্দ্রমা হাসিতেছে, নিম্নের স্নিগ্ধ কিরণরাশি নিশীথ জগতের ক্রোড়ে অকাতরে ছড়াইয়া দিতেছেন। কি অপূর্ব্ব সুর মিলন—সেই স্নিগ্ধরশ্মিময়ী জ্যোৎস্নাশালিনী মাধবী যামিনীর সহিত কপালকুণ্ডলার সেই সরোজ চিত্তবৃত্তির কি অপূর্ব্ব মিলন হইয়া মিশিয়াছে! সেদিন যাইবার কপালকুণ্ডলার অস্তিত্বই যেন

মন্দরভাবে সুরে মিশিয়া তাঁহার মনোমধ্যে সঙ্গীত করিতে লাগিল। আবার ঘটনার মিলনে যখন কপালকুণ্ডলা অন্তরূপ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াছেন—চন্দ্রমা লুক্কায়িত হইল, আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় মসীময় হইয়া শাসিতে লাগিল। ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভিন্ন সুরে আর একটি সঙ্গীত হইল। ইহার পরে যখন "বিদ্যুতালোকে কপালকুণ্ডলা দেখিতে পাইলেন, প্রাঙ্গনস্তম্ভিত দাঁড়াইয়া এক দীর্ঘকার পুরুষ—সেই কাপালিক—সুর পঞ্চমে উঠিল।

৪। "সপ্তগ্রামের এক নির্জ্জন উপনগরভাগে নবকুমারের বাস। নবকুমারের বাটীর পশ্চাদ্ভাগেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটীর সম্মুখে প্রায় ক্রোশার্দ্ধ দূরে একটি ক্ষুদ্র খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। গৃহটি ইষ্টক রচিত। এই গৃহের সৌধোপরি দুইটী নবীনা রমণী দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করিতেছিলেন। সন্ধ্যাকাল উপস্থিত। চতুর্দ্দিকে যাহা দেখা যাইতেছিল, তাহা লোচনরঞ্জন বটে। নিকটে একদিকে নিবিড় বন; তন্মধ্যে অসংখ্য পক্ষী কলরব করিতেছে। অন্য দিকে ক্ষুদ্র খাল, রূপার সূতার ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। দূরে মহানগরীর সৌধমালা, নববসন্ত-পবন-স্পর্শ লোলুপ নাগরিকগণে পরিপূরিত হইয়া শোভা করিতেছে। অন্য দিকে, অনেক দূরে নৌকাভরণা ভাগিরথীর বিশাল বক্ষে সন্ধ্যাতিমির ক্রমে ক্রমে গাঢ়তর হইতেছে।

এই স্ত্রীলোক দুইটি শ্যামাসুন্দরী ও কপালকুণ্ডলা। কি সুন্দর সুরসম্মিলন! এক দিকে প্রকৃতি অন্য দিকে সংসার—এক দিকে নিবিড় অরণ্য, বিশাল হৃদয় ভাগীরথী—অন্যদিকে সৌধমালা পরিবেষ্টিত নাগরিক পরিপূরিত নগর। একদিকে কপালকুণ্ডলা, অন্যদিকে শ্যামাসুন্দরী!

৫। কপালকুণ্ডলা শ্মশানে আনীতা হইতেছেন—পাঠকবর্গ একবার সেই দৃশ্যটি মনে করুন।

ঐ দেখুন ঐ ভীষণ নর-শোণিত-পিপাসু, নির্দ্দয়তার কঠোর স্তম্ভ তান্ত্রিক কাপালিক খড়্গ হস্তে অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছে—পশ্চাতে ঐ 'সুরা-গরল-প্রজ্বলিত-হৃদয়', পত্নী-চরিত্রে সন্দিহান, জীবনের মমতাত্যাগী, নবকুমার ভবানীভাব বিমোহিতা, আত্মবিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্পা, উর্দ্ধে স্থাপিত দৃষ্টি, কপালকুণ্ডলাকে বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিয়া প্রেতভূমিতে গমন করিতেছেন। সময় নিশিথিনী—স্থান শ্মশানভূমি। কপালকুণ্ডলা আকাশমণ্ডলে দেখিতেছেন—"নবনীরদ নিন্দিত মূর্ত্তি। গলবিলম্বিত নর কপাল-মালা হইতে শোণিত স্রুতি হইতেছে; কটিমণ্ডল বেড়িয়া নরকররাজি দুলিতেছে—বাম করে নরকপাল—অঙ্গে রুধিরধারা, ললাটে বিষমোজ্জ্বল জ্বালা বিভাসিত, লোচন প্রান্তে বালশশী সুশোভিত। যেন ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিতেছেন।" যখন কপালকুণ্ডলা এইরূপ দেখিতেছেন, নবকুমার ভীমনাদে ডাকিলেন, 'কপালকুণ্ডলে'—কি সুন্দর সুর সম্মিলন ঘটিল! সবই ভয়ানক হইতে ভয়ানকতর। কিন্তু এই ভয়ানক কাদম্বিনী আজ হইতে শীঘ্রই

আবার করুণাবারি মুঞ্চিত হইয়া পাঠককে অপূর্ব্ব ভাবান্তরে বিস্মিত করত নয়নজলে অভিষিক্ত করিল। শ্মশান ভূমিস্থ সেই নদী আর সেই নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার কথা মনে করুন। কথা কহিতে কহিতে উভয়ে জলের ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। "বিশাল তরঙ্গিণী হৃদয় অন্ধকারে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে চৈত্র মাসের বায়ু অপ্রতিহত বেগে গঙ্গা হৃদয়ে প্রধাবিত হইতেছিল, তাহার কারণ তরঙ্গাভিঘাত জনিত রব গগন ব্যাপ্ত করিতেছিল।" দম্পতির হৃদয়ের সহিত এই তরঙ্গিণীর কিছুমাত্র প্রভেদ দেখিতে পান কি? নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার হৃদয়েও কি সেইরূপ করিয়া অপ্রতিহত বেগে চৈত্র-বায়ু প্রধাবিত হইতেছিল না? কে বলিবে সংস্কারবন্ধন ছিন্ন করিয়া কপালকুণ্ডলা ভৈরবীপদে আত্মবিসর্জ্জন করিবার জন্ত যখন পঞ্চভূতের বিষম বন্ধনটিও ছিঁড়িবার কথা ভাবিতেছিলেন, ছিঁড়িবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, তখন যে তাঁহার হৃদয়খানি ঐ তরঙ্গিণীর মত বায়ুবিক্ষিপ্ত তরঙ্গময় হইতেছিল না, কে বলিবে? যখন নবকুমার আপনার হৃৎপিণ্ড সদৃশ প্রিয়তমাকে জীবিতাবস্থায় বিসর্জ্জন দিতে—আত্মহস্তে ছেদন করিতে সঙ্কল্প করিয়া শ্মশানক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন, এই চৈত্র বায়ুপ্রক্ষিপ্ত তরঙ্গাদির ন্যায় তখন যে তাঁহার হৃৎপিণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয় নাই, কে বলিবে? আবার দেখুন, যখন ধীরে ধীরে নবকুমারের চৈতন্য হইতেছিল, কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে রমণীসুলভ দয়ার ভাব বিকাশ পাইতেছিল,—সম্মুখস্থ নদীতে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইল। কপালকুণ্ডলা যখন হাত ধরিয়া নবকুমারকে উঠাইলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন 'তুমি ত জিজ্ঞাসা কর নাই,' যখন নবকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় কহিতেছিলেন 'চৈতন্য হারাইয়াছি; কি জিজ্ঞাসা করিব বল—মৃণ্ময়ি! বল—বল—আমায় রাখ গৃহে চল!' তখন সেই নদীতে জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইতেছিল। আবার যখন কথা কহিতে কহিতে কপালকুণ্ডলার সেই ভবানীর আজ্ঞা মনে পড়িল, বলিলেন, 'ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। স্বামিন্! তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না' এবং নবকুমার 'আ মৃণ্ময়ি!—না!—' এইরূপ উচ্চশব্দ করিয়া কপালকুণ্ডলাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহু প্রসারণ করিলেন—"চৈত্র বায়ু বিতাড়িত এক বিশাল নদীতরঙ্গ আসিয়া তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটাধোভাগে প্রহৃত হইল; অমনি তটমৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলা সহিত ঘোররবে নদীপ্রবাহ মধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল।"—বর্ণনায় পরাকাষ্ঠা হইল নাকি?

কপালকুণ্ডলায় দুইটি ভাব বর্ণনা আমাদিগকে বড়ই মোহিত করিয়াছে। একটি কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের প্রণয় বর্ণনা ও অপরটি পদ্মাবতীর প্রণয় বিশেষ বর্ণনা।

নবকুমারের প্রণয় বর্ণনা স্থলে গ্রন্থকার লিখিতেছেন "এই প্রেমাধিক্যের সর্ব্বদা কথায় ব্যক্ত হইত না। কিন্তু নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে দেখিতেই

যেরূপ সজল লোচন তাঁহার প্রতি অনিমিষ চাহিয়া থাকিতেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইত, যেরূপ নিষ্প্রয়োজন, প্রয়োজন কল্পনা করিয়া কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ বিনা প্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার কাছে আসিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ বিনা প্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা পাইতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ দিবানিশি কপালকুণ্ডলার সুখ সচ্ছন্দতার অন্বেষণ করিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত। এই ৬টি কথা, প্রত্যেকেই লাখ কথার এক কথা। এমন সহজ, অথচ এমন সুন্দর ও সঠিক প্রণয় লক্ষণ আর কোথাও দেখিয়াছ কি? ইহার মধ্যে আরও একটু নিগূঢ়ত্ব আছে। পত্নীর প্রতি সাধারণতঃ পতির যেরূপ প্রণয় চিহ্ন প্রকাশিত হয়, ইহা সেরূপ নহে। বিবাহের পূর্ব্বে, ভাবী পত্নী বা পতির মনোভাব জানিবার পূর্ব্বে যেরূপ প্রণয়চিহ্ন প্রকাশিত হয়, ইহা সেইরূপ। যে তোমাকে ভালবাসে কিনা জান না, যাহাকে প্রকাশ্যভাবে তোমার ভালবাসার কথা জানাইতে সঙ্কুচিত হও, যাহাকে ভাল বাসিয়া তুমি ভালবাসার প্রতিদান প্রত্যাশা কর না বা পাইতেছ না, তাহার প্রতি তোমার যেরূপ প্রণয়-চিহ্ন প্রকাশিত হইবে, ইহা সেইরূপ চিহ্ন। কপালকুণ্ডলার প্রকৃতি ভাবিয়া দেখিলে নবকুমারের এইরূপই প্রণয়-চিহ্ন প্রকাশিত হওয়া স্বাভাবিক। কবিবর ইহাও ভুলিলেন না। তাই বলি, এ প্রণয় বর্ণনাটি অতি সুন্দর হইয়াছে।

আর একটি দেখ। কক্ষমধ্যে লুৎফ-উন্নিসা বসিয়া আছেন। তাঁহার সহিত নবকুমারের প্রেমালাপ চলিতেছে। লুৎফ-উন্নিসা নবকুমারের প্রতি অনুরক্ত, নবকুমার কিন্তু ইহাতে কিছু বিরক্ত। অনেক কথার পরে যখন নবকুমার বলিলেন 'তুমি আবার আগ্রাতে ফিরিয়া যাও আমার আশা ত্যাগ কর।'

'এ জন্মে নহে।' লুৎফ-উন্নিসা তীরবৎ দাড়াইয়া উঠিয়া সদর্পে কহিলেন,

'এজন্মে তোমার আশা ছাড়িব না।' মস্তক উন্নত করিয়া, ঈষৎ বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গী করিয়া, নবকুমারের মুখ-প্রতি অনিমিক আয়ত চক্ষু স্থাপিত করিয়া, রাজরাজমোহিনী দাড়াইলেন। যে অনবনমনীয় গর্ব্ব হৃদয়াগ্নিতে গলিয়া গিয়াছিল, আবার তাহার জ্যোতিঃ স্ফুরিল, যে অজেয় মানসিক শক্তি ভারতরাজ্যশাসন কল্পনায় ভীত হয় নাই, সেই শক্তি আবার প্রণয়দুর্ব্বল দেহে সঞ্চারিত হইল। ললাট দেশে ধমনী সকল স্ফীত হইয়া রমণীর রেখা দিল; জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু রবিকরমুখরিত সমুদ্রবারিবৎ ঝলসিতে লাগিল। নাসারন্ধ্র কাঁপিতে লাগিল। স্রোতবিহারিণী রাজহংসী যেমন গতি-বিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গী করিয়া দাঁড়ায়, দলিতফণা ফণিনী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি এ উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন। কহিলেন, 'এ জন্মে না। তুমি আমারই হইবে।

"সেই কুপিত ফণিনী মূর্ত্তি প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে নবকুমার ভীত হইলেন। লুৎফ-উন্নিসার অনির্ব্বচনীয় দেহ-মহিমা এখন যেরূপ দেখিতে পাইল-

লেন, সেরূপ আ'র কখন দেখেন নাই। কিন্তু সে শ্রী বজ্রসূচক বিদ্যুতের ন্যায় মনোমোহিনী, দেখিয়া ভয় হইল। নবকুমার চলিয়া যান, তখন সহসা তাঁহার আর এক তেজোময়ী মূর্ত্তি মনে পড়িল; একদিন নবকুমার তাঁহার প্রথমা পত্নী পদ্মাবতীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে শয়নাগার হইতে বহিষ্কৃতা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এমনই তাহার চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়াছিল, এমনই ললাটে রেখা-বিকাশ হইয়াছিল; এমনই নাসারন্ধ্র কাঁপিয়াছিল; এমনই মস্তক হেলিয়াছিল! বহুকাল সে মূর্ত্তি মনে পড়ে নাই, এখন মনে পড়িল। অমনই সাদৃশ্য অনুভূত হইল। সংশয়াধীন হইয়া নবকুমার সঙ্কুচিত স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন 'তুমি কে?'

"যবনীর নয়নতারা আরও বিস্ফারিত হইল। কহিলেন 'আমি পদ্মাবতী।"

এ বর্ণনাটি বড়ই সুন্দর। ক্রোধোদ্দীপ্ত পদ্মাবতীর আকৃতি বর্ণনা অতীব মনোহারিণী। বর্ণনা পড়িয়া আমরা যেন তাহাকে এইরূপ ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। তার পর আকৃতি দেখিয়া নবকুমারের পদ্মাবতীকে মনে করা আরও সুন্দর। অঙ্কুরেও বৃক্ষত্ব বর্ত্তমান থাকে। বাল্যকালের পদ্মাবতীতেও বর্ত্তমান পদ্মাবতী বিদ্যমান ছিল। নবকুমার পদ্মাবতীকে ইতিপূর্ব্বে এতবার দেখিয়াও চিনিতে পারে নাই, এখন এই মূর্ত্তিতে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন। বড়ই সুন্দর সত্য কথা। এক এক জনার এইরূপই এক একটা ভাব থাকে বটে। বাহুল্য বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজনীয়।

বঙ্কিমচন্দ্র।

মৃণালিনী।

ইতিবৃত্ত।

এই উপন্যাসখানি বাঙ্গালা ১২৭৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। কপালকুণ্ডলার ন্যায় এখানিও গ্রন্থকারের হস্তে সম্যক্ সংশোধিতা হইয়া যন্ত্রস্থা হইয়াছিল।

অদ্যাবধি ইহার ৮ম সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। সংস্করণগুলিতে কিছু পরিবর্ত্তনও পরিলক্ষিত হয়। পূর্ব্বে গ্রন্থের প্রারম্ভে বখতিয়ারের হস্তীযুদ্ধ ও হস্তীযুদ্ধে আসন্ন মৃত্যু হইতে হেমচন্দ্র কর্ত্তৃক তাহার প্রাণরক্ষা, হেমচন্দ্রের কারাবাস, ও তথা হইতে তাহার পলায়ন প্রভৃতি কয়েকটি ঘটনা গ্রন্থের সর্ব্বপ্রথমে সংযোজিত ছিল। বোধ হয়, উক্ত ঘটনাগুলির সহিত মূল গ্রন্থের কোন সংস্রব নাই বলিয়া গ্রন্থকার তাহা পরবর্ত্তী সংস্করণে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও সমালোচনা।

১। মনোরমা। *

ভালবাসা নানাপ্রকার। অবস্থাভেদে ইহার প্রকারভেদ হইয়া থাকে। যেরূপ মানবের মূলপ্রকৃতি সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ, কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষা, সমাজ প্রভৃতি অবস্থাভেদে তাহা বিভিন্ন প্রকারের হইয়া দাঁড়ায়—ভালবাসারও বুঝি মূল প্রকৃতি সেইরূপ সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ, বিভিন্ন অবস্থাতেই ইহার বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। ফলতঃ এক কথার মধ্যেই অন্য কথা অন্তর্নিবিষ্ট আছে—ভালবাসাও মানবের একটি মূল প্রকৃতি।

আমাদিগের বঙ্গীয় কবি বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যে, প্রণয়ের এই বিভিন্নরূপ বড়ই উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। তাঁহার এক একটী রমণী—এক এক প্রকারের ভালবাসা; তাঁহার এক একটি পুরুষ—এক এক প্রকারের প্রণয়! প্রণয়ই তাঁহার কাব্যের প্রধান উপাদান; এই উপাদানটি তাঁহার হস্তে এরূপ প্রকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে যে, এতদ্দ্বারা তিনি যথেচ্ছা প্রণয়ের মূর্ত্তি গঠন করিয়া লইতে পারেন। ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তি অনেক স্থলে দেখা যায়, কিন্তু এক বৃত্তির এরূপ বিভিন্ন মূর্ত্তি এত স্পষ্ট ও এত মধুর আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয় না।

এক এক করিয়া তাঁহার রমণী-মূর্ত্তিগুলি পরীক্ষা কর, দেখিবে প্রায়ই প্রণয়ভেদে তাহাদের বিভিন্নতা হইয়াছে। সেই বিমলা, আয়েষা, তিলোত্তমা; কপালকুণ্ডলা, পদ্মাবতী, শ্যামাসুন্দরী; সেই মৃণালিনী মনোরমা, গিরিজায়া; সেই সূর্য্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, কমলমণি; সেই শৈবলিনী, সুন্দরী, দলনী; সেই লবঙ্গলতা, রজনী; ভ্রমর, রোহিণী; শান্তি, কল্যাণী; সেই প্রফুল্ল, সাগর; নন্দা, শ্রী, রমা—ইহারা সকলেই ন্যূনাধিক সেই ভালবাসার জন্যই প্রকারভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার পুরুষগুলিও প্রায় এইরূপ—তবে পুরুষচরিত্রে ততটা প্রকারভেদ হইতে পারে নাই; ইহার কারণও আছে। শৈবলিনীর একদিকে প্রতাপ, একদিকে চন্দ্রশেখর থাকিলে যেরূপটি ঘটিয়া উঠে, সীতারামের একদিকে নন্দা অপরদিকে রমা থাকিলে সেরূপটি ঘটিয়া উঠে না। প্রণয়ের বৈচিত্র্য অবস্থানুযায়ী রমণীতে যেরূপ দেখিতে পাইবে, পুরুষে সেরূপ দেখিতে পাইবে না। এই প্রণয় লইয়া রমণীকে যেরূপ ঘটনা-বৈচিত্র্যে পড়িতে হয়, পুরুষকে সেরূপ হয় না। ইহাই আমাদিগের সামাজিক গঠন—তাই পুরুষের প্রণয়-বৈচিত্র্য অপেক্ষা রমণীর প্রণয়-বৈচিত্র্যই বঙ্গীয় কাব্যে অধিক দেখিয়া থাকি।

---

* গ্রন্থের নায়িকা মৃণালিনীর চরিত্রই সর্ব্ব প্রথমে ব্যাখ্যাত হওয়া উচিত। কিন্তু সে সুন্দর চিত্রটি এত প্রাঞ্জল যে তাহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। আমরা তাই 'মনোরমা' ও 'পশুপতি' ব্যাখ্যা করিয়া 'হেমচন্দ্র-মৃণালিনী' ও 'গিরিজায়া-দিগ্বিজয়' ব্যাখ্যা করিব।

এই প্রণয় বৈচিত্র্য বঙ্কিম বাবু তাঁহার কাব্যের মধ্যে কারণসহ অতি সুন্দর করিয়া আঁকিয়াছেন। যেরূপ অবস্থায় ভালবাসা যেরূপ আকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তিনি সেইরূপ অবস্থা আঁকিয়া, সেইরূপ ভালবাসার মূর্ত্তি আঁকিয়াছেন। সর্ব্বত্রই যে তিনি এইরূপ করিয়াছেন, এরূপ নহে—কোন কোন স্থলে আমরা সেই মূর্ত্তিই দেখিতে পাই, তৎপ্রতি কারণ বড় একটা দেখিতে পাই না। বাল্যাবস্থার কথা না জানিলে এ কারণ সহজে ব্যাখ্যা করার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যেখানে তিনি এইরূপ গোড়ার কথা পাঠকবর্গকে বলিয়া দিয়াছেন, সেইখানেই আমরা কারণসহ ভালবাসার এক একটি মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কপালকুণ্ডলা, ভ্রমর, কুন্দনন্দিনী প্রভৃতির কথা মনে করিলে এ কথার সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

আমাদিগের শীর্ষোক্ত মনোরমাও ভালবাসার সেইরূপ একটি মূর্ত্তি। অবস্থাধীন এই মূর্ত্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠিত হইয়াছে।

এ সময়ে পাঠকবর্গকে একবার কপালকুণ্ডলাকে স্মরণ করিতে হইবে। পার্থক্য তুলনা হইতেই জাত—তুলনা করিয়া না দেখাইলে সে পার্থক্য ভাল বুঝা যাইবে না। আমরা তাই কপালকুণ্ডলার অবস্থার সহিত মনোরমার অবস্থা তুলনা করিয়া পাঠকবর্গকে দেখাইব, অবস্থাভেদে কিরূপে মূর্ত্তিভেদ হইয়া থাকে। ক্ষেত্রাদির দোষগুণে একপ্রকার শস্যের বিভিন্ন প্রকার ও প্রকৃতি প্রাপ্তির ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় যে মনের গঠনও ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহা বঙ্কিম বাবু তদীয় কাব্যমধ্যে অতি সুন্দররূপে দেখাইয়াছেন।

কপালকুণ্ডলার ভিত্তি বা পূর্ব্ব পরিচয় এইরূপ—

কপালকুণ্ডলা বাল্যকালে নৌকাপথে তস্কর কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া কোনও এক সমুদ্রতটে পরিত্যক্ত হয়েন। সেই সাগরতীরে, প্রকৃতির নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে এক দুরন্ত কাপালিক তাঁহাকে প্রতিপালন করে। কাপালিক ঘোর নিষ্ঠুরপ্রকৃতি—মানববধে তাহার ধর্ম্ম। সে সেই বিজন প্রদেশে নরবলি ইত্যাদি তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা ভবানীর সাধনা করিত। তাহার বিশ্বাস ছিল যে, ভগবতী ইহাতেই সাধকোপরি প্রসন্না থাকেন। সেই বিজন কাননে আরও একটি বৃদ্ধ ভবানীভক্ত ছিল। তাহার সহিত কপালকুণ্ডলার স্নেহ ভক্তি বিনিময় হইত। সেই বৃদ্ধ অধিকারী কপালকুণ্ডলাকে কন্যানির্ব্বিশেষে পালন করিতেন।

এই ভিত্তি হইতে, কিরূপে ঘটনার পর ঘটনা সংযোগে কপালকুণ্ডলা নির্ম্মিতা হইয়াছিল, তাহা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি। এখন আমরা মনোরমার কথা বলিব।

মনোরমার ভিত্তি এইরূপ—

কাশীধামে কেশব নামে এক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। হৈমবতী নামে তাঁহার এক কন্যা ছিল—অষ্টমবর্ষে [illegible] পশুপতি নামক কোন এক ব্রাহ্মণকুমারের সহিত তাহার বিবাহ দেন। একজন জ্যোতির্ব্বিদ কেশবের নিকট গণনা করিয়া বলিয়াছিল যে কেশবের কন্যা অল্পবয়সে বিধবা হইয়া স্বামীর অনুমৃতা হইবে। কেশব এইভয়ে বিবাহের রাত্রেই কন্যা লইয়া স্থানান্তরে গমন করিলেন।

পশুপতির সহিত তাঁহার আর কোন সম্বন্ধ রহিল না।

অল্পবয়সেই হৈমবতীর মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল, কিছুদিন পরে আবার পিতৃবিয়োগও ঘটিল। মৃত্যুকালে কেশব জনার্দ্দন নামে তাঁহার এক আচার্য্যের হস্তে হৈমবতীকে সমর্পণ করিয়া যান। আচার্য্য শিষ্যের নিকট প্রতিশ্রুত থাকেন, পশুপতির সহিত সেই কন্যার পরিণয়-কাহিনী কখনও তিনি পশুপতি কিম্বা হৈমবতীর নিকট প্রকাশ করিবেন না। এই ঘটনার কিছুদিন পরে জনার্দ্দন নবদ্বীপে গমন করিয়া এক প্রাচীনা শক্তিহীনা ব্রাহ্মণীর সহিত মনোরমাকে লইয়া একখানি পর্ণকুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা নিতান্ত দরিদ্র ও নিঃসহায় ছিলেন। কিছুদিন পরে প্রবল বাত্যায় ইঁহাদের সেই পর্ণকুটীরটিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তদবধি ইঁহারা এক বৃহৎ রাজপুরীর একাংশে রাজানুমতি লইয়া বাস করিতেছিলেন। ওদিকে পশুপতি কালক্রমে উন্নতিলাভ করিয়া নবদ্বীপের ধর্ম্মাধিকার-পদ প্রাপ্ত হইলেন। তিনি তখন পর্য্যন্তও দারান্তর-পরিগ্রহ করেন নাই। কালক্রমে হৈমবতীর জ্ঞানসঞ্চার হইলে, তিনি জানিতে পারিলেন যে, পশুপতি তাঁহার স্বামী। এই সংবাদ জানিবার পূর্ব্বে তিনি আপনাকে বিধবা বলিয়াই জানিতেন। অন্যের নিকটে তিনি বিধবা বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। পশুপতির সহিত তাঁহার নির্জ্জনে প্রণয়ালাপ হইত। পশুপতি হৈমবতীকে চিনিতেন না, কিন্তু তৎপ্রতি একান্ত আসক্ত ছিলেন। হৈমবতী এ কথাও জানিতেন।

ইহাই মনোরমার প্রকৃত ভিত্তি বা পূর্ব্বপরিচয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে আর একটি কথা বলিয়া লইতে হইবে। কথাটি এই—

নবদ্বীপে পশুপতি ও মনোরমার আবাস-সন্নিকটে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা ছিল। দীর্ঘিকার তীরে কতকগুলি বট, অশ্বথ, পাইন, বকুল, প্রভৃতি প্রকাণ্ড বৃক্ষাদি অতি ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট ছিল। এমন ভাবে ছিল, যে দিবসেও সেই দীর্ঘিকাতীর ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিত। এমন অবস্থায় যাহা ঘটিয়া থাকে, তাহা ঘটিল। কিম্বদন্তী হইল যে, সেই সরোবরে ভূতযোনী বিহার করিয়া থাকে। সুতরাং সে স্থানে বড় একটা কেহ গমন করিত না। কিন্তু হৈমবতী এই স্থানে সর্ব্বদা আগমন করিতেন। একদিন হেমচন্দ্র তাঁহার নিকটে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, মাঝে তাঁহার গা জ্বালা করে, তাই মধ্যে মধ্যে এই সরোবরে তিনি স্নান করিতে আসিয়া থাকেন।

এই কপালকুণ্ডলা ও মনোরমার ভিত্তিস্বরূপ যাহা বলা হইল, তাহা এক প্রকার দার্শনিক কাব্য। কপালকুণ্ডলায় সে কাব্য অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার—মনোরমায় তাহা কিছু জটিল। কিন্তু দুইটি চরিত্রেই ইহার প্রত্যেক কথা ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। মনোরমার এই পূর্ব্ব পরিচয় না বুঝিলে, তাহার অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য লুক্কায়িত থাকে। এই বাঁধনি বা পূর্ব্বপরিচয় কবির একটি অতি অদ্ভুত কাব্য-কৌশল। ক্রমে তাহা বিশদ হইবে।

মনোরমার আকৃতি গ্রন্থকার দুই

প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন। এক প্রকার হেমচন্দ্রের সম্মুখে ধরিয়া, অন্যপ্রকার পশুপতির সম্মুখে ধরিয়া। এই উভয়ের নিকটে, তাঁহার দ্বিবিধ মূর্ত্তিই প্রকাশিত হইত সত্য, তবু যেন দুই জনের কাছে দুই মূর্ত্তিই কিছু বেশি স্ফুটিত। আমরা 'মৃণালিনী' হইতে উক্ত স্থানগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি

"হেমচন্দ্র হতাশ্বাস হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিল। হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিয়া প্রথম মুহূর্ত্তে তাঁহার বোধ হইল সম্মুখে একখানি "কুসুম-নির্ম্মিতা দেবী-প্রতিমা"। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, "প্রতিমা সজীব", তৃতীয় মুহূর্ত্তে দেখিলেন, প্রতিমা নাই, বিধাতার নির্ম্মাণ-কৌশল-সীমা রূপিণী "বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী।"

সেই ব্যাপীকূলের আকৃতিও বলিয়া রাখি। হেমচন্দ্র সহসা চমকিত হইয়া দেখিলেন, "চন্দ্রালোকে, সর্ব্বাধঃস্থ সোপানে, জলে চরণ রক্ষা করিয়া শ্বেত-বসন-পরিধানা কে বসিয়া আছে। স্ত্রী-মূর্ত্তি বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। শ্বেত-বসনা, অবেণীসম্বদ্ধকুন্তলা; কেশজাল স্কন্ধ, পৃষ্ঠদেশ, বাহুযুগল, মুখমণ্ডল, হৃদয়, সর্ব্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।"

পাঠকবর্গের এই বর্ণনা দুইটি পাঠ করিয়া আর কাহাকেও মনে পড়ে কি? অন্যত্র—

"সেই রত্নপ্রদীপ্ত দেবীমন্দিরে, চন্দ্রালোক-বিভাসিত দ্বারদেশে, মনোরমাকে দেখিয়া, পশুপতির হৃদয় উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল। মনোরমা নিতান্ত খর্ব্বাকৃতা নহে, তবে তাঁহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইত, তাহার হেতু এই যে, মুখকান্তি অনির্ব্বচনীয় কোমল, অনির্ব্বচনীয় মধুর; নিতান্ত বালিকা বয়সের ঔদার্য্যবিশিষ্ট; সুতরাং হেমচন্দ্র যে তাঁহার পঞ্চদশবৎসর বয়ঃক্রম অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা অন্যায় হয় নাই। মনোরমার বয়ঃক্রম যথার্থ পঞ্চদশ কি ষোড়শ, কি তদধিক, কি তন্ন্যূন, তাহা ইতিহাসে লিখে না। পাঠক মহাশয় স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন।"

"মনোরমার বয়স যতই হউক না কেন, তাহার রূপরাশি অতুল—চক্ষে ধরে না। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে সর্ব্বকালে সে রূপরাশি দুর্লভ। একে বর্ণ সোণার চাঁপা; তাহাতে ভুজঙ্গশিশু-শ্রেণীর ন্যায় কুঞ্চিত অলকশ্রেণী মুখখানি বেড়িয়া থাকে; এক্ষণে বাপীজল সিঞ্চনে সে কেশ ঋজু হইয়াছে; অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত নির্ম্মল ললাট; ভ্রমর-ভর-স্পন্দিত নীল-পুষ্পতুল্য কৃষ্ণতার, চঞ্চল, লোচনযুগল; মুহুর্মুহুঃ আকুঞ্চন-বিস্ফারণ-প্রবৃত্ত রন্ধ্রযুক্ত সুগঠন নাসা; অধরোষ্ঠ যেন প্রাতঃসূর্য্যের কিরণে প্রোদ্ভিন্ন রক্তকুসুমাবলীর স্তরযুগল তুল্য। কপোল যেন চন্দ্রকরোজ্জ্বল, নিতান্ত স্থির, গঙ্গাম্বুবিস্তারবৎ প্রসন্ন; শাবকহিংসাশঙ্কায় উত্তেজিতা হংসীর ন্যায় গ্রীবা,—বেণী বাঁধিলেও সে গ্রীবার উপরে অবদ্ধ ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কেশ সকল আসিয়া কেলি করে। দ্বিরদ-রদ যদি কুসুমকোমল হইত, কিম্বা চম্পক যদি গঠনোপযোগী কাঠিন্য পাইত, কিম্বা চন্দ্র-কিরণ যদি শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে সে বাহুযুগল গড়িতে পারা যাইত,—

সে হৃদয় কেবল সেই হৃদয়েই গড়া যাইতে পারিত। এ সকলই অন্য সুন্দরীর আছে, মনোরমার রূপরাশি কেবল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীণ সৌকুমার্য্যের জন্য। তাঁহার বদন সুকুমার; অধর, ভ্রূযুগ, ললাট, সুকুমার, সুকুমার কপোল; সুকুমার কেশ। অলকাবলী যে ভুজঙ্গশিশুরূপী সেও সুকুমার ভুজঙ্গশিশু। গ্রীবায়, গ্রীবাভঙ্গীতে সৌকুমার্য্য; বাহুতে বাহুর প্রক্ষেপে সৌকুমার্য্য; হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে সেই সৌকুমার্য্য। সুকুমার চরণ, চরণবিন্যাস সুকুমার। গমন সুকুমার, বসন্তবায়ুসঞ্চালিত কুসুমিত লতার মন্দান্দোলন তুল্য; বচন সুকুমার, নিশীথ সময়ে জলরাশিপার হইতে সমাগত বিরহসঙ্গীত তুল্য; কটাক্ষ সুকুমার, ক্ষণমাত্র-জন্য মেঘমালাযুক্ত সুধাংশুর কিরণসম্পাত তুল্য; আর এই যে মনোরমা দেবী গৃহদ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন,—পশুপতির মুখাবলোকন জন্য উন্নতমুখী, নয়নতারা ঊর্দ্ধস্থাপনস্পন্দিত, আর বাপীজলার্দ্র, অবদ্ধ কেশরাশির কিয়দংশ হস্তে ধরিয়া, এ কারণ ঈষন্মাত্র অগ্রবর্ত্তী করিয়া, যে ভঙ্গীতে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছেন,—ও ভঙ্গীও সুকুমার; নবীন সূর্য্যাগ্রে সদ্যঃপ্রফুল্ল দলমালাময়ী নলিনীর প্রসন্ন ব্রীড়াতুল্য সুকুমার। সেই মাধুর্য্যময় দেহের উপর দেবীপার্শ্বস্থিত রত্নদীপের আলোক পতিত হইল। পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন।

এইটি মনোরমার "মোহিনী" মূর্ত্তি।

সেই গম্ভীরনাদী বারিধিকূলে সন্ধ্যালোকে ক্লান্ত নবকুমারের চক্ষে সেই কপালকুণ্ডলার মূর্ত্তি দেখিয়াছ; অদ্য এই রত্নপ্রদীপ দীপ্ত দেবীমন্দিরে চন্দ্রালোক-বিভাসিত দ্বারদেশে দেবীপ্রতিমাপার্শ্বে মুগ্ধ ধর্ম্মাধিকার পশুপতির চক্ষে এই মনোরমা মূর্ত্তি অবলোকন কর। কিছু সাদৃশ্য দেখিতে পাও কি? কপালকুণ্ডলাকে যদি মনোরমার সমাজে পুষিয়া লওয়া যাইত, তবে তাহাতে এ মনোরমামূর্ত্তি দেখিতে পাইতে কি?

আবার হৈমবতীর এ মনোরমামূর্ত্তি ছাড়িয়া মনোরমার এক মনোরমামূর্ত্তি দেখ—

"পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌন্দর্য্য-সাগরের এক অপূর্ব্ব মহিমা দেখিতে পাইলেন। যেমন সূর্য্যের প্রখর করমালায় হাস্যময় অম্বুরাশি মেঘসঞ্চারে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর কৃষ্ণকান্তি প্রাপ্ত হয়, তেমন পশুপতি দেখিতে দেখিতে মনোরমার (হৈমবতীর) সৌকুমার্য্যময় মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে লাগিল। আর সে বালিকা সুলভ ঔদার্য্যব্যঞ্জক ভাব রহিল না। অপূর্ব্ব তেজোভিব্যক্তির সহিত, প্রগল্‌ভ বয়সেরও দুর্লভ গাম্ভীর্য্য তাহাতে বিরাজ করিতে লাগিল।"

এইটি মনোরমার চিন্তাশালিনী গম্ভীরা মূর্ত্তি।

এই দুই আকৃতি বা প্রকৃতি পশুপতি এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, মনোরমার দুই মূর্ত্তি—"এক মূর্ত্তি 'আনন্দময়ী, সরলা, বালিকা, অন্য মূর্ত্তি 'গম্ভীরা, তেজস্বিনী, প্রখরাবুদ্ধিশালিনী'।" এই দ্বিবিধ মূর্ত্তি এই স্থলে একের পরে অন্যটি কেন প্রকটিত হইল, তাহা আমরা পরে বলিব, এখন এই দুই

মূর্ত্তি বা প্রকৃতি মনোরমার কিরূপে গঠিত হইয়াছিল, তাহাই বলি।

মনোরমা যে আকৃতি বা প্রকৃতিতে আনন্দরূপিণী অলৌকিক সরলা বালিকা, সেই আকৃতি মধ্যে আমরা কপালকুণ্ডলা অথবা মৃন্ময়ীমূর্ত্তি দেখিতে পাই। এই রূপও সেই—কথাবার্ত্তাও তদনুরূপ। শৈশবে যে যে ভাবে পালিতা হয়, যৌবনেও তাহার সে ভাব অন্তর্হিত হয় না। নির্জ্জনে পরিবর্দ্ধিতা মাতৃহীনা কপালকুণ্ডলা ও কুন্দনন্দিনীর ন্যায় হৈলবতীও শৈশবে পালিতা হইয়াছিলেন। অবস্থানুযায়ী হৃদয়ের স্নেহভাগ ইঁহাদের সকলের মধ্যেই কিছু অধিকতর প্রকাশিত হইয়াছিল। ইঁহারা সংসারে থাকিয়াও একরূপ সংসার-ছাড়া ছিলেন। ইহা ইঁহাদের অলৌকিক সরলতার একটি প্রধান কারণ। অন্য সম্বন্ধে একমাত্র কারণ বলিলেও চলে, মনোরমা সম্বন্ধে আমরা ইহাকে একটি প্রধান কারণ বলিব। কারণ, মনোরমার এ প্রকৃতির কারণান্তরও পরিদৃষ্ট হয়।

মনোরমার অপর প্রকৃতিটি কিছু মিশ্র, জটিল সুতরাং ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। ইহা ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে অন্য দুই একটি কথা বলিয়া লইতে হয়।

আমরা সচরাচর মানুষের এক প্রকার প্রকৃতিই দেখিয়া থাকি, তবে মনোরমার এই দ্বিবিধ প্রকৃতি কোথা হইতে আসিল? মনোরমা কি কবির কল্পনাসঞ্জাত কোন এক অমানুষী সৃষ্টি?—এইরূপ কথা অনেকের মনেই উত্থাপিত হইবার সম্ভব; সুতরাং এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিয়া দেওয়া ভাল।

প্রথম কথাটি এই। কবিগণ এক প্রকার বিভাগানুসারে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন। সাময়িক কবি ও সর্ব্বসময়ের কবি। যাঁহারা সাময়িক কবি তাঁহারা সেই সময়ের আচার, ব্যবহার, নীতি প্রভৃতি লইয়াই তাঁহাদের কাব্য-চিত্রিত চরিত্র অঙ্কিত করিয়া থাকেন। ইঁহাদিগকে স্বাভাবিক (Realistic) কবিও বলা হইয়া থাকে। অপর শ্রেণীয় কবিগণ এরূপ কোন সময়ের চিত্র লইয়া ব্যতিব্যস্ত হয়েন না। তাঁহাদের মনীষী কল্পনা, তাঁহাদের সেই সময়ের সীমা অতিক্রম করিয়া পরবর্ত্তী ভাবী সময়ে লইয়া যাইতে সক্ষম; তাই তাঁহারা যাহা দেখিতে বা জানিতে পারা যায়, শুদ্ধ তাহাই কাব্যের বিষয়রূপে গ্রহণ না করিয়া, যাহা ভবিষ্যতে দেখিতে জানিতে পারা যাইতে পারে, তাহাও কাব্যে অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া থাকেন। যাহা সকল সময়েই সমান ছিল, যাহা সকল সময়েই সমান থাকিবে, সেই অবিকৃত অপরিবর্ত্তনীয় মূল "তত্ত্ব" গুলি ভিত্তিরূপে রাখিয়া তদুপরি তাঁহারা ভবিষ্যৎ-দর্শী তীক্ষ্ণ প্রতিভাবলে বিবিধপ্রকার চরিত্রাদি সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সেই সব চরিত্র যদিও তাঁহাদের সমসময়ে অলৌকিক (Unrealistic) বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, সময়ান্তরে তাঁহাদের সেই সব চরিত্রই আবার লৌকিক বলিয়া আদরণীয় হইতে পারে। এক কথায় বলিতে কবি মাত্রই (যাঁহারা প্রকৃত কবি, তাঁহাদের কথাই বলিতেছি) স্বাভাবিক চরিত্রস্রষ্টা—কবি মাত্রই Realistic Realistic (স্বাভাবিক) না হইলে তিনি কখন কবি-পদবাচ্য হইতে পারেন না। অপর প্রকৃতি

এই, এক শ্রেণীর কবির দৃষ্টি অদূরদর্শী, তাঁহারা তাঁহাদের নিজের সময়ের চিত্রই আঁকিতে সক্ষম—অন্য শ্রেণীর দৃষ্টি কল্পনা-বলে দূরদর্শিনী, তাঁহারা পরবর্ত্তী সময়েরও চিত্র দিব্য চক্ষে দেখিতে পারেন। এক শ্রেণীর কবি যাহা আছে, তাহাই দেখাইতে পারেন, অন্য শ্রেণীর কবি, যাহা নাই, কিন্তু যাহা হইতে পারে, তাহাও দেখাইতে সক্ষম—প্রত্যুত তাঁহারা তাহাই দেখাইয়া থাকেন। ফল কথা— Real এবং Ideal এ কোন প্রভেদই নাই। সবই Real নতুবা Ideal এর কোন তাৎপর্য্যই থাকে না। আমরা এই দুই শ্রেণীর কবিকে, সাময়িক কবি (Poet of his own age) এবং সর্ব্ব সময়ের কবি (Poet of all ages) নামে অভিহিত করিয়া থাকি। বলা বাহুল্য, যে শেষোক্ত শ্রেণীর কবিই সম্যক উচ্চে সমাসীন।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা আমাদিগের বর্ত্তমান প্রস্তাবের অপ্রাসঙ্গিক কথা সন্দেহ নাই। তবু, এ কথা লইয়া সময়ে সময়ে বড় ঝগড়া করিতে হয়, স্বাভাবিকতা অস্বাভাবিকতা লইয়া অনেক তর্কও শুনিতে পাওয়া যায়, তাই মনোরমার চরিত্রের স্বাভাবিকতা বা অস্বাভাবিকতা উপলক্ষে এই কথা গুলি বলিয়া লইলাম। পাঠকগণ অনুগ্রহ করিয়া এই অসম্বদ্ধ কথা মাপ করিবেন।

যাহা বলা হইল, তাহা হইতে এইটুকু প্রাসঙ্গিক কথা বাহির করা যাইতে পারে যে, যাহা সচরাচর ঘটে না, বা আমরা যাহা সচরাচর দেখিতে পাই না তাহাই অলৌকিক বা অস্বাভাবিক নহে। যদি মনোরমার মত দ্বিবিধ প্রকৃতিশালী লোক নাই দেখিতে পাওয়া যায়, তবু এ চরিত্রকে হঠাৎ অস্বাভাবিক বলিতে তাহারও অধিকার নাই। এরূপ সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে আরও অনেকটা দেখিয়া লইতে হইবে।

দ্বিতীয় কথা এই। মনোরমা আমাদিগের বর্ত্তমানেরও স্বাভাবিক চিত্র বটে। মনোরমার প্রকৃতি এখনকার মানুষেও দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা রমণীবৃন্দের স্ফুটনোন্মুখী যৌবনের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁহারা মনোরমার এ দ্বিবিধ মূর্ত্তিতে কিছুমাত্র অস্বাভাবিকতা দেখিতে পাইবেন না। স্ত্রীলোকদিগের সেইরূপ বয়সে, তাহারা এক একটি ছোট খাটো মনোরমা। এত উজ্জ্বল, এত মধুর না হউক, মনোরমা বটে। একদিকে বালিকা বয়সের প্রকৃতি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতে চলিতেছে, অন্যদিকে প্রৌঢ় বয়সের গাম্ভীর্য্য ধীরে ধীরে আবির্ভূত হইতেছে। সেই গঙ্গাযমুনাসম্মিলন কালে, রমণীগণ এইরূপ মনোরমা হইয়া উঠেন। তাঁহারা মাতা পিতার কাছে, বয়স্ক অভিভাবকদিগের কাছে প্রতীয়মান হয়েন বালিকা—স্বামীর নিকট প্রতীত হয়েন যুবতী। তাহাই বা কেন, এক স্বামীর নিকটের দুই ভাবে পরিচিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সেই সংসারজ্ঞানশূন্য সরলতা-ক্ষেত্রে যেন একটু একটু করিয়া জ্ঞানগাম্ভীর্য্যের ছায়া পড়িতে থাকে। এই সময়কার এই প্রকৃতি যাঁহার চরিত্রে অবস্থাক্ষেত্রে স্থায়ী হইয়া দাঁড়ায়, তিনিই আমাদিগের এই কবির মনোরমা হইয়া পড়েন।

যাঁহাদিগের এই রমণীয় রমণীপ্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া দেখিবার সুযোগ হয় নাই,

বা যাঁহারা স্মৃতিপথে এ সকল কথা আর আনিতে পারেন না, তাঁহাদিগকে একটি অতি স্থূল দৃষ্টান্ত প্রদান করিতে পারি। আমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের অধ্যাপক-শ্রেণী মধ্যেও মনোরমার মত দ্বিপ্রকৃতিক লোক বিরল নহে। এক এক সময়ে তাঁহাদের অদ্ভুত সরলতা বা অজ্ঞানতা দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা দুরূহ হইয়া উঠে, আবার এক এক সময়ে তাঁহাদেরই জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। এ দৃষ্টান্তটি অতি স্থূল—সকলের চক্ষেই ইহা পড়ে কিন্তু তাহাতে কাহারও বিস্ময় হয় না। এতদপেক্ষা আমাদিগের পূর্ব্বকথিত রমণী প্রকৃতিতে লোকের অধিক বিস্ময় হইয়া থাকে। কিন্তু মনোরমা পাঠ করিলে যেরূপ বিস্ময় হয়, এরূপ ইহার কিছুতেই হয় না। ইহার কারণও পরিষ্কার—মনোরমা কবির কাব্য। কবি এই এই প্রকার দ্বিবিধ প্রকৃতির একত্রাবস্থান মনোরমার চিত্রে আঁকিয়াছেন, এই সুন্দর রহস্যটি আরও সুন্দর করিয়া আমাদিগের চক্ষুর কাছে ধরিয়াছেন, তাই মনোরমা এত বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। আরও এক কথা। অধ্যাপকের কথাটা কারণসহ এত সুস্পষ্ট যে, তাহাত বিস্ময়ের কিছুই নাই। যৌবনোন্মুখী কামিনীর সেই মিশ্র প্রকৃতিটি একটু লক্ষ্য সাপেক্ষ ও সর্ব্বত্র অধিক সময় স্থায়ী নহে, তাই তাহাও সকলের নিকটে তাদৃশ বিস্ময়কর নহে। মনোরমার প্রকৃতিটি কবি উজ্জ্বল-ভাবে চক্ষে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতেছেন, আর সমস্ত মনোরমাই এই প্রকৃতি লইয়া —তাই মনোরমা কিছু বিস্ময়োৎপাদক। মনোরমার এ দ্বিবিধ প্রকৃতির কারণ তত পরিষ্কার নহে, তাই মনোরমা অত্যন্ত বিস্ময়কর। বিস্ময়ের কারণ এই—আবার আনন্দের কারণও এই। যখন অন্যান্য চরিত্রের ন্যায় মনোরমার চরিত্রেরও কারণটি খুঁজিয়া পাই, তখন কবির মনোরমা আমাদিগের মনোহারিণী হইয়া উঠে। এখন আমরা সেই কারণ খুঁজিব।

মনোরমার আনন্দময়ী, সরলা বালিকা মূর্ত্তির একটি কারণ পূর্ব্বপ্রস্তাবে কথিত হইয়াছে। সেটি—বয়স ও অবস্থা বিশেষের সম্মিলন। আমাদিগের মনে হয়, ইহার অন্য একটি কারণও আছে। সেটি মনোরমার কার্য্যবিশেষে আত্যন্তিকী একাগ্রতা। মনোরমার তবে সেই কার্য্যটি কি?—ইহা বুঝিতে পারিলেই, আমরা মনোরমার সব বুঝিলাম। এখন তাহাই দেখিব।

মনোরমার কার্য্য আর কিছুই নহে—চিন্তা। মনোরমা দিবারাত্রি কেবল আপনার চিন্তাবিশেষেই মগ্ন থাকিত। ভগবান তাহাকে তাহার এরূপ চিন্তার কারণও দিয়াছিলেন। মনোরমা বড়ই দুঃখিনী। এই চিন্তাই মনোরমার সারল্যের অন্তর কারণ, আবার এই চিন্তাই মনোরমার প্রখরা বুদ্ধিশালিনী ও গম্ভীরা তেজস্বিনী প্রকৃতির কারণ। * এই চিন্তাই মনো-

* এই কথাটি কিছু নূতন বোধ হইতে পারে। চিন্তা হইতে যে সরলতা উৎপন্ন হইতে পারে, এ কথা সহসা কেহ বিশ্বাস না করিতেও পারেন। আমাদিগের যাহা মত ও বিশ্বাস, আমরা, যাহা অনুভব করিয়াছি, তাহাই লিখিলাম। পাঠকবর্গ না হয় কথাটা একবার ভাবিয়া দেখিয়া রাখি-

রমার সর্ব্বস্ব। এই চিন্তা হইতেই প্রায় তাহার সেই দুই মূর্ত্তিই জাত—এক "অনন্যমতী, সরলা, বালিকা মূর্ত্তি"—অপর "গম্ভীরা, তেজস্বিনী, প্রখরবুদ্ধিশালিনী মূর্ত্তি"। প্রথম মূর্ত্তির কথা কিছু বলা হইয়াছে, তৎপ্রতি অন্য কারণও ছিল। এখন এই শেষের মূর্ত্তির কথা বলিব। ইহাতে সমস্ত মনোরমাই ব্যাখ্যাত হইবে।

পাঠক তোমরা সেক্ষপীয়রের চিন্তা-প্রপীড়িতা মনোরমামূর্ত্তি নিরীক্ষণ কর। হ্যামলেট রাজপুত্র, তাঁহার চিন্তার বিষয় পিতার মৃত্যু, মাতার চরিত্র, প্রণয়িনীর ব্যবহার, পিতৃব্যের পাপরাশি; আমাদের মনোরমা দুঃখিনী ব্রাহ্মণ কন্যা, তাহার চিন্তার বিষয় তাহার নিজের জীবন। সত্য বটে, হ্যামলেটের চিন্তার বিষয়ের সহিত মনোরমার চিন্তার বিষয় তুলনা করা যায় না, কিন্তু তবু চিন্তার গাঢ়ত্বে বুঝি মনোরমা হ্যামলেটকেও পরাস্ত করিয়াছেন। অত বড় পুরুষ হ্যামলেটের কাছে, অত বড় চিন্তাও বাহ্য; আমাদিগের দুঃখিনী ব্রাহ্মণবালিকার কাছে, তাহার ঐ ক্ষুদ্র চিন্তার বিষয়ও তাহা। হ্যামলেটের চিন্তা, পুরুষের চিন্তা—অনন্ত আকাশে অনন্ত মেঘরাশির ন্যায় অনন্তরূপিণী, ভয়ঙ্করী; মনোরমার চিন্তা রমণীর চিন্তা, ক্ষুদ্র ভুজঙ্গরূপিণী, বিষময়ী। বীরোত্তম হ্যামলেট সেক্ষপীয়রের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি—স্থিরোন্মাদিনী মনোরমাও বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। শুধু আমরা, আমাদিগের নিকটে হ্যামলেটের সেই গম্ভীর বিরাট চিন্তা অপেক্ষা মনোরমার এই গাঢ় বিষময়ী চিন্তা কিছু ভাল লাগে। হ্যামলেটের হোরেসিও ছিল, কুন্দনন্দিনীরও এক দিন কমলমণি ছিল, কিন্তু দুঃখিনী বালিকার সেই দীর্ঘিকা বই আর কেহই ছিল না। অধিক কি কহিব, হ্যামলেটের স্রষ্টা হ্যামলেটের জন্য যেরূপ যত্ন প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, মনোরমার স্রষ্টা মনোরমার প্রতি তাহার শতাংশের একাংশও গ্রহণ করেন নাই। দুঃখিনীকে তিনি মৃণালিনীর আলয়ে সামান্যার ন্যায় রাখিয়া দিয়াছেন। মনোরমার প্রতি আমাদিগের স্নেহের ইহাও এক কারণ বটে।

মনোরমার কিসের চিন্তা? এ কথা যে পাঠক আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, তাঁহাকে আমাদিগের পূর্ব্ববর্ণিত মনোরমার পুষ্পপরিচয় আর একবার ভাবিতে বলি।

এই দেখুন, এই একটি বঙ্গীয় বিধবা করলগ্নকপোল হইয়া নির্জ্জনে একা মনে কি ভাবিতেছে। পাঠক কি জিজ্ঞাসা করিবেন উহার কিসের চিন্তা? ঐ শ্বেত বস্ত্র পরিহিতা নিরাভরণা স্ফুটনোন্মুখ যৌবনা রূপময়ী বালবিধবার চিন্তার বিষয় কি আপনাকে বলিয়া দিতে হইবে? যদি তাহা না হয়, মনোরমার চিন্তার কথাও আপনাকে না বলিলে চলিবে। ঐ মূর্ত্তি মনোরমার চিন্তার প্রথম মূর্ত্তি। মনোরমা প্রথমে নিজের নিকটে এইরূপ বালবিধবা রূপে পরিচিতা।

সেন। সরলতা চিন্তা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না এরূপ কথা যাঁহারা বলিবেন তাঁহাদিগকে অন্ততঃ ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে চিন্তা সরলতাবিরোধী নহে। নতুবা, মনোরমার চিত্রে সামঞ্জস্য নাই, ইহাই বলিতে হইবে। এরূপ কথা যাঁহারা বলিবেন, তাঁহাদিগের সহিত আমাদিগের কোনও তর্ক নাই।

যখন মনোরমার চিন্তাস্রোত এইরূপে প্রবাহিত, তখন হঠাৎ তিনি জানিতে পারিলেন যে তিনি বাস্তবিক বিধবা নহেন—তাঁহার স্বামী পশুপতি এখনও জীবিত আছেন। কথা ফিরিল, বিধবা সধবা হইল, কিন্তু চিন্তা ত থামিতে পারিল না। ক্ষণিক হর্ষোচ্ছ্বাসে এ চিন্তাস্রোত মন্দ-গতি হইল বটে, কিন্তু সে উচ্ছ্বাস থামিলে আবার সে স্রোত বহিতে লাগিল। কে সেই স্বামী? কোথায় সে পশুপতি? ইত্যাকার চিন্তায় তখন মনোরমা প্রপীড়িত হইতে লাগিলেন। কিন্তু চিন্তার এ প্রকৃতিও সহসাই পরিবর্ত্তিত হইল। মনোরমা ধীরে ধীরে সেই জ্যোতির্ব্বিদের কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন। এ যে কপালকুণ্ডলার হৃদয়ে সেই ত্রিপত্রচ্যুতিস্মৃতি! ক্রমে আরও চিন্তা—মনোরমার তবে ত সংসারে কেহই নাই। পূর্ব্বে যে অশ্রুবিন্দু সলজ্জভাবে নীরবে গণ্ডদেশ বহিয়া পড়িত, এখন তাহা অবাধে গণ্ডদেশ প্লাবিত করিতে লাগিল। এ সংসারে মনোরমার কেহই নাই। মা বাপ, ঘর বাড়ী, কিছুই নাই। পূর্ব্বে তিনি আপনাকে বিধবা জানিতেন, কিন্তু এখন যে সধবা জানিয়াও তাঁহার কষ্ট কমিল না। সেই যে একটু হর্ষের ভাব—তাহাও যে ঘোর দুঃখমিশ্রিত। এইরূপে আর একটি তরঙ্গ মনোরমার জীবনোপরি ভাসিয়া গেল। এই খানেও যদি এ চিন্তা শেষ হইত, আমরা মনোরমাকে চিন্তাময়ী বলিয়া এত কথা বলিতে সাহস করিতাম না। এতদূর পর্য্যন্ত ত সে চিন্তায় অনন্যসাধারণত্ব কিছুই নাই। এর পরে মনোরমা তাঁহার নিরুদ্দিষ্ট স্বপ্নময় স্বামী পশুপতির সন্দর্শন লাভ করিলেন। একে বালবিধবার স্বামী, তাহে আবার সেই স্বামী পশুপতি—একি কম উচ্ছ্বাসের কথা? ইহার উপর আবার সেই পশুপতির সান্নিধ্যে বাস—তাহার প্রণয়-প্রাপ্তি, এ যে মনোরমার ধারণার অতীত! সেই স্বামী আবার তাহাকে কুলটার ন্যায় ভাল বাসিতেছে—মনোরমা একবার বলিতে পারিতেছে না যে, সে কুলটা নহে, বিধবা নহে, পশুপতির পরিণীতা পত্নী! রমণীহৃদয় ভিন্ন অন্য হৃদয় হইলে, এই খানেই যে তাহা ফাটিয়া যাইত! এত উচ্ছ্বাস কি ক্ষুদ্র হৃদয়ে নিবদ্ধ রাখা যায়? কিন্তু মনোরমাকে তাহা রাখিতে হইয়াছিল। জ্যোতির্ব্বিদের গণনার কথা তখনও মনোরমার হৃদয়ে জাগ্রত, সে কি কম কথা? তার পরে আরও দেখ, পশুপতি তখন রাজা—মনোরমা দুঃখিনী ব্রাহ্মণকন্যা—বালবিধবা বলিয়া পরিচিতা, এ কথা শুনিলে পশুপতি, কি মনে করিবেন? তিনি কি এ কথা বিশ্বাস করিবেন? না, দুঃখিনী বালবিধবার দুরাকাঙ্ক্ষাজনিত প্রতারণা বলিয়া ভাবিবেন? আর—আর বিশ্বাস করিলেই কি তাহা বলা উচিত? মনোরমার প্রতি পশুপতির যেরূপ প্রবল আসক্তি, না জানি পশুপতি ইহা শুনিয়া কিরূপ করিয়া বসেন? না জানি এই সুসংবাদে কি দুর্ঘটনা ঘটিয়া উঠে। আর পশুপতি বিশ্বাস করিলেই বা অন্যে তাহা বিশ্বাস করিবে কেন? অন্যে যে কত কথা বলিবে—এজন্য পশুপতিকে যে কত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইবে—তাঁহার যত মুখ ছোট হইবে—মনোরমার তাহা জীবন থাকিতে বলা হইবে না। ভাবিয়া ভাবিয়া মনোরমা অন্তরের ভিতর যে অক্ষয় গৈট-

খানে এ কথা লুকাইয়া রাখিল। একি কম কথা? একি কম শিক্ষা? একি কম অভ্যাস? ইহাতে হৃদয় গভীর হইবে না ত কিসে হৃদয় গভীর হইবে? ইহাতে হৃদয়ে তেজ বাঁধিবে না ত কিসে হৃদয়ে তেজ বাঁধিবে? বাধ্য হইয়া মনোরমাকে এ শিক্ষা পাইতে হইয়াছিল। এ আগুণ হৃদয়ে পুষিয়া রাখিতে হইয়াছিল। জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় তাই ইহা সেই হৃদয় প্রদেশকে দগ্ধ করিয়া গভীর হইতে গভীরতর করিতে লাগিল।

আরও দেখ। মনোরমা যেখানে থাকিতেন, সে একটা বৃহৎ রাজপুরী। তাহার এক কোণে মনোরমা বাস করিতেন। সেই বিশাল পুরীটি অন্যত্র খালি পড়িয়া থাকিত। ইহা দেখিয়া, না জানি মনোরমা কতবার তাঁহার নিজের কথা ভাবিয়াছেন! শূন্য পিঞ্জর পড়িয়া রহিয়াছে—স্বামিবিরহিতা দুঃখিনী চিন্তিতা রমণীর পক্ষে সে দৃশ্য কি কম ব্যাকুলতা-পরিবর্দ্ধক—চিন্তার উদ্দীপক? উহাতেই যেন তাঁহাকে ভাবিতে প্ররোচনা জন্মাইত। তাই মনোরমা ভাবিতেন, বসিয়া রাত্রিদিন কেবলই ভাবিতেন। ভাবিতে ভাবিতে যখন হৃদয়-প্রদেশ ক্ষতবিক্ষত হইত, মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত হইত, তখনই বুঝি তাঁহার গা জ্বালা করিত। সেই গায়ের (?) জ্বালা নিবারণার্থ তিনি সেই বাপীজলে অবগাহন করিতে যাইতেন। কি চমৎকার কবিত্ব! সেই দীর্ঘিকা—আর সেই মনোরমা! কেমন একসুরে গাঁথা—সেই শালতমাল-তমসাচ্ছন্না বিশাল দীর্ঘিকা আর সেই চিন্তাচ্ছায়াসমাকুলা মনোরমার হৃদয়? কোথায় হোরেসিও—এই দীর্ঘিকার সহিত তাহার তুলনা? সত্য সত্যই এইখানে আসিলে তাহার অন্তর্জ্বালা নিবারণ হইত। এ মনোরমার অবগাহনযোগ্য দীর্ঘিকা। এই দীর্ঘিকার সোপানোপরি আসীন হইয়া তাহার বক্ষোদেশস্থ ছায়ার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া না জানি মনোরমা কত ভাবনাই ভাবিতেন। এইরূপ চিন্তা, এইরূপ প্রকৃতির সহানুভূতিতে তাঁহার সুখ দুঃখ দুইই উৎপন্ন হইত। ইহাই তাঁহাকে অদ্ভুত সারল্যময়ী ও অদ্ভুত গাম্ভীর্য্যশালিনী, বালিকা ও পূর্ণযৌবনা তরুণী নির্ম্মাণ করিয়াছিল। এ কথা আরও কি বুঝাইতে হইবে?

এই আমাদিগের মনোরমা! সংসারে এমন অপূর্ব্ব সৃষ্টি আর কখন দেখিয়াছ? মনোরমা পরগৃহে পালিতা বলিয়া তুচ্ছ করিও না—মনোরমা কাব্যরাজ্যে রাজ্ঞী।

মনোরমার দ্বিবিধ মূর্ত্তি অবস্থা বিশেষে প্রকাশিত হইত। মনোরমার জ্ঞানমূর্ত্তি, আন্তরিক চিন্তা হইতে উৎপন্না—তাহা হৃদয়ের গূঢ়তম প্রদেশে লুকায়িত থাকিত। হৃদয়কবাটে আঘাত না লাগিলে সে মূর্ত্তি বাহির হইত না। মনোরমা তাহা এমনই লুকায়িত রাখিতে অভ্যাস করিয়াছিলেন যে, সময়বিশেষে তিনিও তাহা ভুলিয়া যাইতেন। এই আত্মবিস্মৃতির অবস্থাতেই তিনি কপালকুণ্ডলা, মৃন্ময়ী বা অপূর্ব্ব সরলা বালিকা। আমস্থা মনোরমা অন্যরূপ। একরূপে তিনি কুসুম-নির্ম্মিতা কপালকুণ্ডলা—অন্যরূপে তিনি চিন্তাময়ী উন্মাদিনী। এক মূর্ত্তিতে তিনি হেমচন্দ্রের স্নেহময়ী কনিষ্ঠা ভগিনী, পশুপতির প্রেমপ্রবৃত্তিময়ী বালিকা ভার্য্যা,—

অন্যরূপে তিনি হেমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা সহোদরা—পশুপতির জ্ঞাননিরবৃত্তিময়ী প্রৌঢ়া পত্নী। হরগৌরীমূর্ত্তি, সেই—আধ শিব আধ উমা মূর্ত্তি দেখিয়াছি—এরূপ একাধারে যুগলমূর্ত্তি দেখি নাই।

পাঠক, এতক্ষণ আমরা মনোরমার, দার্শনিক সৌন্দর্য্য দেখিলাম—এখন তাহার কাব্যের সৌন্দর্য্য দেখিব। এতক্ষণ আমরা বাহিরের অবস্থার সহিত মনোরমার অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ দেখিয়াছি—এখন আমরা অন্তঃপ্রকৃতির বহিষ্কৃরণ দেখিব। এখন আমরা মনোরমার কাব্যাংশ ব্যাখ্যা করিব। তাহার অদ্ভুত বালিকাভাব—অলৌকিক সারল্য, তাহার অপূর্ব্ব প্রৌঢ়ভাব—প্রখরা বুদ্ধিবৃত্তি, তাহার অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন—সময়ে এক ভাব, সময়ান্তরে ভাবান্তর, গ্রন্থকার কিরূপে পাঠকবর্গকে অনুভব করাইয়াছেন, তাহাই বলিব। পশুপতি প্রতি মনোরমার ভালবাসা উপসংহারের জন্য রহিল। একমাত্র পশুপতির সহিত সম্বন্ধান্বিত হইয়াই যে মনোরমা মনোরমারূপে গঠিত হইয়াছিল, অবস্থাধীন ভালবাসাতেই যে মনোরমা ঐরূপে বিকশিতা হইয়াছিল, তাহা পুর্ব্বেই একরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

বয়সের ধর্ম্মে মনোরমার দ্বিবিধ প্রকৃতি বিবিধ অবস্থার সংঘটনে স্বভাবতঃই কিছু জটিল ও রহস্যময় হইয়া পড়িয়াছিল। তদুপরি কবি স্বীয় অপূর্ব্ব কুহকদণ্ডসঞ্চালনে মনোরমাকে একটি অপূর্ব্ব প্রহেলিকায় পরিণতা করিয়াছেন। মনোরমা আকৃতিতে প্রহেলিকা, মনোরমা প্রকৃতিতে প্রহেলিকা। মনোরমা হেমচন্দ্রের নিকট প্রহেলিকা—মনোরমা পশুপতির নিকট প্রহেলিকা—মনোরমা তোমার আমার সকলের নিকট প্রহেলিকা। কুহেলিকময়ী উষা বা ছায়াময়ী গোধূলি কেহই মনোরমার ন্যায় প্রহেলিকাময়ী নহে।

মনোরমার আকৃতিতে যে প্রহেলিকা ছিল, কবি তাহা সর্ব্বপ্রথমেই পাঠকবর্গকে দেখাইয়া দিলেন। তাহাকে হেমচন্দ্র প্রথমে ভাবিলেন, 'কুসুমনির্ম্মিতা দেবীপ্রতিমা, পরে মনে করিলেন—(এখনও হেমচন্দ্র মুগ্ধ ও আত্মবোধরহিত)—কোন 'সজীব প্রতিমা'—শেষে স্থির হইল, মনোরমা কুসুমনির্ম্মিতা দেবীপ্রতিমাও নহে, সজীব প্রতিমাও নহে—এক 'অপূর্ব্ব বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী।' এ প্রহেলিকা কিন্তু হেমচন্দ্রের কখনও পরিষ্কার হইল না—হেমচন্দ্র কখনও ঠিক করিতে পারিলেন না, মনোরমা 'বালিকা' না 'তরুণী'! আকৃতিতে মনোরমা প্রহেলিকা নয় কি?

তার পর দেখ। পশ্চাৎ হইতে হেমচন্দ্রের উত্তরীয় ধরিয়া টানিয়া, "বীণানিন্দিত স্বরে সুন্দরী কহিলেন, 'তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে? তোমার কথা উনি শুনিতে পাইবেন কেন?' হেমচন্দ্র কহিলেন, 'তাহা ত পাইলেন না দেখিলাম। তুমি কে?' বালিকা কহিল, 'আমি মনোরমা।' হে। 'ইনি তোমার পিতামহ?' মনোরমা। 'তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে?' হে। 'শুনিলাম ইনি এ গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমি তাই নিবারণ করিতে আসিয়াছি।' ম। 'এ গৃহে

এক রাজপুত্র আসিয়াছেন। তিনি আমাদিগকে থাকিতে দিবেন কেন?' হে। 'আমিই সেই রাজপুত্র। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা এখানে থাক।' ম। 'কেন?' এ কেনর উত্তর নাই। হেমচন্দ্র অন্য উত্তর না পাইয়া কহিলেন, 'কেন? মনে কর, যদি তোমার ভাই আসিয়া এই গৃহে বাস করিত সে কি তোমাদিগকে তাড়াইয়া দিত?' ম। 'তুমি কি আমার ভাই?' হে। 'আজি হইতে তোমার ভাই হইলাম। এখন বুঝিলে?' ম। 'বুঝিয়াছি। কিন্তু ভগিনী বলিয়া আমাকে কখন তিরস্কার করিবে না ত?' হেমচন্দ্র মনোরমার কথার প্রণালীতে চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, এ কি অলৌকিক সরলা বালিকা? না উন্মাদিনী? কহিলেন, 'কেন তিরস্কার করিব?' ম। 'যদি দোষ করি?' হে। 'দোষ দেখিলে কে না তিরস্কার করে?' মনোরমা ক্ষুণ্ণভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, বলিলেন, 'আমি কখন ভাই দেখি নাই; ভাইকে কি লজ্জা করিতে হয়?' হে 'না'। ম। 'তবে আমি তোমাকে লজ্জা করিব না—তুমি আমাকে লজ্জা করিবে?' হে। 'আমার বক্তব্য তোমার পিতামহকে জানাইতে পারিলাম না—তাহার উপায় কি?' ম। 'আমি বলিতেছি।' এই বলিয়া মনোরমা মৃদু মৃদু স্বরে জনার্দ্দনের নিকট হেমচন্দ্রের অভিপ্রায় জানাইলেন। হেমচন্দ্র দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, মনোরমার সেই মৃদু কথা বধিরের বোধগম্য হইল।"

পাঠক এখন এক এক করিয়া মনোরমার এই কার্য্য ও কথাগুলি পরীক্ষা কর—এইরূপ অবস্থায় অপরিচিত যুবকের সম্মুখে অপরিচিত তরুণীর কথা ও ব্যবহারের সহিত ইহার তুলনা কর—অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বার-প্রদেশে নিম্নস্থাপিত দৃষ্টি যৌবনোন্মুখীর কপাট খুঁটিতে খুঁটিতে অপরিচিত বা অল্প পরিচিত অভ্যাগতসহ কথোপকথন মনে কর, দেখিবে মনোমার কি অপূর্ব্ব সারল্যই এতদ্দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে!

প্রথমে ধর, সেইরূপ করিয়া হেমচন্দ্রের উত্তরীয় ধরিয়া টানার কথা। তার পরে কথাগুলি পরীক্ষা কর। বালকবালিকাদিগের স্বভাবই এই যে তাহারা উপযাচক হইয়া কথা বলে, প্রশ্নের প্রতীক্ষা না করিয়াই উত্তর প্রদান করে, না ভাবিয়া না চিন্তিয়া প্রশ্নের পরে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। মনোরমাতেও আমরা এই বালধর্ম্ম দেখিতে পাইলাম না কি? মনোরমা যুবতী—তিনি হেমচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া তাহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিলেন। মনোরমা ইতরবংশজ নহে—মনোরমা ব্রাহ্মণকন্যা, যুবতী, কিন্তু তবু হেমচন্দ্রকে 'তুমি' বলিয়া কথা কহিলেন। একি বালিকার কার্য্য নহে? আবার যখন হেমচন্দ্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'তুমি কে?'—মনোরমা কহিলেন 'আমি মনোরমা!' কি অপূর্ব্ব বালিকার উত্তর! উত্তরটি শুনিয়া আমাদিগের একদিনকার একটি কথা মনে পড়িল। একদিন কোন বন্ধুগৃহে গমন করিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম, একটি পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা আমাদিগের মুখপানে সবিস্ময়ে চাহিয়া

রহিয়াছে। আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'তুমি কে গা?' বালিকা অমনি উত্তর করিল 'আমি সরলা।' সে এমন ভাবে আমার দিকে চাহিয়া কথাটি বলিল যে, আমায় তখন বুঝিতে হইল, বালিকা মনে করিতেছে, সে তাহার নাম বলাতেই তাহার সকল পরিচয় আমরা পাইয়াছি। 'সরলা' বলাতেই সে পরিচিতা হইল, এই তাহার বিশ্বাস। মনোরমাও সেইরূপ একটি উত্তর করিলেন। মনোরমার নাম জানিবার জন্য কিছু হেমচন্দ্র প্রশ্নটি করেন নাই, সুতরাং তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন 'ইনি তোমার পিতামহ?'—মনোরমা হাঁ, না, কিছুই না বলিয়া পূর্ব্বের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিল 'তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে? মনোরমা কি যবতী?

সময়ে সময়ে বালকগণ এইরূপই এক একটি প্রশ্ন করিয়া থাকে যে, বর্ষীয়ান কোন মতে তাহার উত্তর দিয়া উঠিতে পারেন না। একটু বয়স বাড়িলে, সংসারের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা জন্মিলে তাহারা আর সে রকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারে না।' 'এ গাছ কে গড়িল? এ গাছ যে গড়িল, তাকে কে গড়িল?' এবম্বিধ প্রশ্ন বালকেই করিতে পারে। এদিকে দেখ, হেমচন্দ্র মনোরমাকে বলিতেছেন 'আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তোমরা এখানে থাক।' যুবতী মনোরমা জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'কেন?' গ্রন্থকার লিখিলেন 'এ কেনর উত্তর নাই।' মনোরমার প্রশ্ন বালিকার প্রশ্ন নয় কি?

বাপীকূলের দৃশ্যটি একবার মনে করিয়া দেখুন। মনোরমা হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিতেছে 'তোমার এ বেশ কেন? হাতে শূল, কাঁকালে তরবারি; তরবারে একি জ্বলিতেছে? এ কি হীরা? মাথায় এ কি? ইহাতে যে ঝক্ মক্ করিয়া জ্বলিতেছে, এই বা কি? এও কি হীরা? এত হীরা পেলে কোথা?'

"এ রাত্রে এত হীরা পারিয়া কোথায় যাইতেছ? চোর যে কাড়িয়া লইবে।"

কথাগুলি কি আপনাদিগের সম্মুখে একটি কৌতূহলপরায়ণা বালিকামূর্ত্তি স্থাপিত করিতেছে না? মনোরমা এক নিশ্বাসে কত কথা কহিল—কত প্রশ্ন করিল। উত্তরের অপেক্ষা নাই, প্রশ্নের ঔচিত্যানৌচিত্য বোধ নাই। মনোরমা বালিকার ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতেছে—বালিকার ন্যায় চোরের ভয় দেখাইতেছে। কত আর দেখাইব? 'তুমি কি আমার ভাই?' 'বুঝিয়াছি। কিন্তু ভগিনী বলিয়া কখন তিরস্কার করিবে না ত?' এ সকলই মনোরমার মুখে কেমন সুন্দর শুনাইতেছে! যুবতী, ভাবিয়া কথা বলে; বালিকা ভাবিয়া কথা বলে না। হেমচন্দ্রের কথা শেষ না হইতে হইতেই যেন মনোরমাকে আমরা কথা কহিতে শুনিতেছি! কথার প্রণালীতে চমৎকৃত হইয়া যুবতী মনোরমা-সম্বন্ধে হেমচন্দ্র এক দিন মনে করিয়াছিলেন 'এ কি বালিকা না উন্মাদিনী?'

প্রকৃতিতে, ব্যবহারে মনোরমা প্রহেলিকা নয় কি?

যেমন আকৃতি-প্রকৃতিতে মনোরমা প্রহেলিকা, গ্রন্থকার দুই একটি ঘটনা সৃষ্টি করিয়াও মনোরমাকে আবার হেম-

নই প্রহেলিকা করিয়া তুলিয়াছেন। ফলতঃ মনোরমার সমস্তই প্রহেলিকা—কথা, কার্য্য, ভালবাসা, পরিণাম, তাহার কিছুই সরল দৃষ্টিতে পরিষ্কার নহে। তাই বলিতেছিলাম, মনোরমা একটি অদ্ভুত প্রহেলিকা!

অবশ্যই সেই ঘটনাগুলির কথা এই স্থলে বলিয়া লইব।

আমরা দেখিতে পাইলাম হেমচন্দ্র অতি উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিয়াও বধির জনার্দ্দনকর্ত্তৃক শ্রুত হইতে পারিলেন না। কিন্তু মনোরমা অতি মৃদু কথাতেই জনার্দ্দনকে সব বুঝাইয়া দিলেন। এটি কবির অতি সুন্দর কৌশল। কবি জানেন যে ইহার কোন বৈজ্ঞানিক বা অন্যবিধ কারণ আছে কি না, সে সকল কথা তখন, কি হেমচন্দ্র, কি পাঠকবর্গ, কাহারও মনে উদিত হইবার সম্ভাবনা নাই। তখন সকলেরই মনে হইবে, মনোরমা কোন এক অলৌকিক শক্তি সম্পন্না রমণী—মনোরমা দেবী। ইহা জানিয়া কবি এই কুহকদণ্ডটি পরিচালন করিলেন। পাঠকবর্গের পূর্ব্বের প্রহেলিকা আরও ছায়াময়ী হইয়া উঠিল। হাসিতে হাসিতে কবি প্রস্থান করিলেন। পাঠকবর্গ কিন্তু সেই মায়াতেই মুগ্ধ রহিলেন।

ঘটনা সুন্দর, চেষ্টাও ফলবতী। কিন্তু ইহা যদি বাস্তবিকই অলৌকিক হয়, তবে অবশ্য পাঠকবর্গ কুহকীকে প্রশংসা করিতে প্রস্তুত হইবেন না। মিথ্যায় সত্যের ভাণ দিতে পারিলেই কুহকীর প্রশংসা—সত্যে সত্যের ভাণে প্রশংসা কি? মনোরমাকে যদি বাস্তবিকই প্রহেলিকা করিয়া কবি সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহাকে সময়ে সময়ে দৈবীশক্তিসম্পন্না করিয়া পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থিত করিয়া থাকেন, তবে অবশ্য আমরা তাঁহাকে প্রশংসা করিতে প্রস্তুত হইব না। কিন্তু যদি মনোরমা স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কার্য্য করিয়াই পাঠকবর্গের নিকট অলৌকিকা বলিয়া প্রতীতা হইয়া থাকেন, তবে এটা যে কবির এক অদ্ভুত কৌশল, তাহা নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। কথাটি একটু ভাবিয়া দেখা যাউক।

আমাদিগের পাঠকবর্গের মধ্যে যাঁহাদিগের বধির সম্বন্ধীয় অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছেন, আমাদিগের কবি কিরূপে একটি ছোট রকমের অভিজ্ঞতা হইতে কিরূপ একটী অপূর্ব্ব কুহক বিস্তারে সমর্থ হইয়াছেন। ফলতঃ সে অভিজ্ঞতাটুকু না থাকিলে, মনোরমার-এ কার্য্যটি ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠা যায় না। আমাদিগের সৌভাগ্যক্রমে আমরা কোন বধির সহ কথোপকথনে এ রহস্যটি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি। যদি ইহা ভাগ্যে না ঘটিত, হয় ত মনোরমার এ ভাগ্যটি বুঝিতেই পারিতাম না। আমরা উক্ত উপায়ে জানিতে পারিয়াছি, যে, বধিরের কাণের কাছে গিয়া মৃদু কথা কহিলেও সে বুঝিতে পারিবে, কিন্তু একটু দূরে বা কাণের কাছেই উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলে সে শুনিতে পাইবে না। সকল বধিরই এরূপ কি না জানি না, কারণ ইহার বৈজ্ঞানিক কোন কারণ আমরা জ্ঞাত নহি, তবে দুই একজন যে এরূপ থাকে, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। পাঠকবর্গ এক বার বরং পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন

এই এক কথা। তার পরে অন্য কথাও আছে। মনোরমা জনার্দ্দনের ঘরের লোক—জনার্দ্দনের সহিত কথা কহিতে কহিতে সেই সম্বন্ধে উভয়ের অনেকটা সুবিধা হইয়া গিয়াছে। মনোরমা কথা কহিতে আরম্ভ করিলে জনার্দ্দন জানেন যে তিনি সে কথা বুঝিবেন—কতক এই জ্ঞাননিবন্ধন মনোযোগের জন্য, কতক চিরপরিচিত আকার ইঙ্গিত বা মুখের ভাবাদি জন্য, জনার্দ্দন সে কথাগুলি বুঝিতে পারিতেন। হেমচন্দ্র সম্পূর্ণ অপরিচিত—জনার্দ্দন তাঁহার কথা শুনিয়া প্রথমেই বুঝিতে পারিবেন কি না, তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়াছিলেন, সুতরাং মনোযোগ ত আদৌ হয় নাই। মুখ দেখিয়া কোনরূপ সিদ্ধান্তও সম্ভবপর নহে। তবে কথা শেষে যে সকল শব্দ হেমচন্দ্র উচ্চারণ করিতেন বুঝি মৃদু হওয়ার জন্য জনার্দ্দন তাহাই খানিকটা শুনিতে পাইতেন। আর শেষ কথায় একটু মনোযোগী হইবারও সম্ভব—নহিলে উত্তর চলে না। যে কারণেই হউক, বধিরের এইরূপই ঘটিয়া থাকে।

একটি সামান্য কথা লইয়া আমরা এত বকিলাম মনে করিয়া কেহ আমাদিগের প্রতি বিরক্ত হইতে পারেন। আমরা কিন্তু ইহাকে সামান্য মনে করি না। মনোরমাকে একটু অলৌকিক শক্তিসম্পন্না বলিয়া পরিচিতা করিতে, কবি কিছু চেষ্টা করিয়াছেন। এই ঘটনায় তাঁহার সেই চেষ্টার সূত্রপাত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং কবির কৌশল বুঝিতে এটি বলার দরকার। আর, সে চেষ্টা এতদূর ফলবতী হইয়াছে যে, তাহার কথা না বলিলে, মনোরমার ব্যাখ্যাই হইয়া উঠে না। তাই এত কথা বলিতে হইল।

উক্ত ঘটনায় জনার্দ্দন-মনোরমার সম্বন্ধও সুন্দর ব্যাখ্যাত হইয়াছে। মনোরমা যে প্রতিপালক জনার্দ্দনকে কিরূপ প্রতিপালন করিতেন, মনোরমার মুখ কথা শ্রুত হওয়ায় তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম। সুতরাং কল্পনাটি বড়ই মনোহারিণী হইয়াছে।

কবি এই এক স্থানেই মনোরমাকে হেমচন্দ্রের চক্ষে, সুতরাং পাঠকগণের চক্ষে অলৌকিকা বলিয়া পরিচিতা করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। গ্রন্থের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার এই চেষ্টা বিদ্যমান রহিয়াছে! আর দুই একটি ঘটনার কথা উল্লেখ আবশ্যক।

পাঠক বাপীকূলের সেই হেমচন্দ্র ও মনোরমার কথা মনে কর। হেমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিতেছেন 'এখান দিয়া কাহাকে যাইতে দেখিয়াছ?' ম। 'দেখিয়াছি।' হে। 'তাহার কি বেশ?' ম। 'তুরকের বেশ।' হেমচন্দ্র অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। মনোরমা স্ত্রীলোক, হিন্দুরমণী—হিন্দুরাজ্যে তখনও তুরক আগমন করে নাই। তবে মনোরমা চিনিল কি প্রকারে? তারপরে দেখ—যখন মনোরমা হেমচন্দ্রকে তুরক দেখাইতে তদীয় পশ্চাদ্বর্ত্তী হইতে বলিলেন—হেমচন্দ্র কিছু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। মনোরমা তাঁহার মানসিক ভাব বুঝিতে পারিলেন, বলিলেন 'আমাকে বালিকা ভাবিয়া অবিশ্বাস করিতেছ?'। হেমচন্দ্র মনোরমার প্রতি

চাহিয়া দেখিলেন। বিস্ময়াপন্ন হইয়া ভাবিলেন—"মনোরমা কি কুমারী?" পাঠক; তোমরাও কি বিস্মিত হও নাই? ঐ ক্ষুদ্র বালিকাটী ঠিক মনের কথা বলিতে পারিল দেখিয়া চমকিত হও নাই? পূর্ব্বের কথা সকল মনে করিয়া তোমরাও কি মনে ভাব নাই 'মনোরমা কি মানবী' —তখন অবশ্যই মনে করিয়াছ; তখন নিশ্চয়ই তোমাকে কবির কুহকে পড়িতে হইয়াছে। এইরূপ কুহকজাল বিস্তার করিয়া কবি স্বতঃ প্রহেলিকাময়ী মনোরমাকে আরও ছায়াময়ী করিয়া পাঠকবর্গ সমীপে উপস্থিত করিয়াছেন। এ সকল কথা কি বলিবার নহে?

আবার অন্য এক পরিচ্ছেদের কথা মনে কর। হেমচন্দ্র যখন শান্তশীল কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ, তখন মনোরমা হেমচন্দ্রের উদ্ধার সাধন করিয়া কিরূপ তাঁহাকে চমৎকৃত করিতে পারিয়াছিলেন! কিন্তু সে পরিচ্ছেদে পাঠকবর্গ প্রতারিত হইতে পারেন নাই হইতে পারিলে যেন ভাল হইত। সে অধ্যায়ে বঙ্কিম বাবু লিখিয়া লইয়াছেন "মনোরমা পশুপতির নিকট বিদায় লইয়া দ্রুতপদে চিত্রগৃহে আসিলেন। পশুপতির সহিত শান্তশীলের কথোপকথন সময়ে শুনিয়াছিলেন যে, এই ঘরে হেমচন্দ্র রুদ্ধ হইয়াছিলেন"। আমাদিগের বিবেচনায় প্রথম ঘটনায়ও যেরূপ কবি নির্ব্বাক ছিলেন এখানেও সেইরূপ নির্ব্বাক্ থাকিলে ভাল হইত। আর 'ফাঁদ' ও 'মুক্ত' এই দুইটী পরিচ্ছেদ, যদি কোন প্রকারে 'মোহিনী' ও 'মোহিনী' পরিচ্ছেদদ্বয়ের পূর্ব্বে স্থাপন করা যায়, তবে এই রহস্যটি কঠিন হইয়া —অন্য একটি কুহক বিস্তারে সমর্থ হয়। কিন্তু আমাদিগের অভিলাষই মাত্র ব্যক্ত করিতে পারি। কিরূপে তাহা সম্ভবপর হইতে পারে, সে ভার শিল্পীর উপরে।

মনোরমার বালিকাভাব কবি কিরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা, প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন তাহার প্রৌঢ়ভাব কিরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই দেখাইতে হয়। কিন্তু মনোরমাকে অবিকৃতা প্রৌঢ়া আমরা কোন স্থানেই দেখিতে পাই না। সুতরাং বালিকাভাব হইতে ভাবান্তরে পরিবর্ত্তন ব্যাখ্যা করিবার সময়েই উহা ব্যাখ্যাত হইবে। আমরা তিনটি দৃশ্য হইতে এখন এই অপূর্ব্ব ভাবান্তর গুলি পাঠকবর্গ সমীপে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি।

১। পশুপতি মুসলমানদিগের সহিত ষড়যন্ত্র সুস্থির করিয়া অষ্টভুজাকে প্রণামান্তর শয্যাগৃহে যাইবার জন্য ফিরিয়াছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন—"অপূর্ব্ব দর্শন—সম্মুখে দ্বারদেশ ব্যাপিত করিয়া, জীবনময়ী প্রতিমারূপিণী তরুণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পশুপতি অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌন্দর্য্যসাগরের এক অপূর্ব্ব মহিমা দেখিতে পাইলেন। যেমন সূর্য্যের প্রখর করমালায় হাস্যময় অম্বুরাশি মেঘসঞ্চারে ক্রমে ক্রমে গম্ভীর কৃষ্ণকান্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনি পশুপতি দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌকুমার্য্যময় মুখমণ্ডল গম্ভীর হইতে লাগিল। আর সে বালিকাসুলভ ঔদার্য্যব্যঞ্জক ভাব রহিল না। অপূর্ব্ব তেজোভিব্যক্তির সহিত, প্রগল্‌ভবয়সেরও দুর্লভ গাম্ভীর্য্য তাহাতে বিরাজ করিতে লাগিল।"

দেখিলাম অপূর্ব্ব ভাবান্তর। তরুণী মনোরমা প্রৌঢ়া হইলেন। এখন ইহার কারণ অনুসন্ধান করা যাউক।

ইতিপূর্ব্বে মনোরমা পশুপতির মন্ত্রণা সব স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সে কথাগুলি মনোরমার প্রীতিকর কথা নহে। স্বামী কুপথে পদার্পণ করিতেছে—স্ত্রীর নিকটে ইহা অসহ্য যন্ত্রণার বিষয়। এই কুপথ হইতে পশুপতিকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য মনোরমা আজি স্বামি সন্নিধানে আগমন করিয়াছিলেন। অদ্য তিনি পশুপতিকে এজন্য তিরস্কার করিবেন, কুপথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করিবেন, অন্তরে এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াই পশুপতির গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু পশুপতিকে দেখিবামাত্র তাঁহার ভাবান্তর ঘটিল। প্রৌঢ়া মনোরমা তরুণী হইলেন। হইবার কারণ আছে। মনোরমা পশুপতির ভার্য্যা—পশুপতি তাঁহার অন্তরের উপাস্য দেবতা প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর। যুবতী মনোরমা এখনও এহেন স্বামীর সহিত মিলিতা হইতে পারেন নাই, সুতরাং মিলনের পূর্ব্বে প্রণয়ের যে উৎকট ভাবটি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, সে ভাবটি এখনও সম্যক্ তিরোহিত হইতে পারে নাই। মনোরমা চিত্তজয়ী—মনোরমা গ [illegible]—যাহাই হউন, এই ধর্ম্মসঙ্গত মিল[illegible]র জন্য একটা ব্যাকুলতা তাঁহাতেও ছি[illegible]। তাই যখন মনোরমা প্রথমে পশুপ[illegible]কে দেখিতে পাইলেন, তাঁহার পূর্ব্ব মনোভাব যাহাই থাকুক না কেন, "স্বর্য্যের প্রখরকরমালায় হাস্যময় অম্বুরাশির ন্যায় তাঁহার সুন্দরী তরুণী মূর্ত্তি বহিরভ্যন্তরে বিরাজ করিতে লাগিল।"

কিন্তু মনোরমা সামান্যা তরুণী নহে। তিনি আত্মচিত্ত সংযত করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে আত্মসংযম করিলেন। ক্ষণিক উচ্ছ্বাস হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সেটি স্ত্রী প্রকৃতি ও প্রণয়ের সম্মোহন ভাব প্রদর্শন জন্য। সেটি মনোরমাকে আরও মাধুর্য্যময়ী করিয়া তুলিবার জন্য। আত্মসংযতা হইয়া মনোরমা পূর্ব্বের কথা স্মরণ করিতে লাগিলেন। অমনি "মেঘসঞ্চারে অম্বুরাশি যেরূপ ক্রমে ক্রমে গম্ভীর কৃষ্ণকান্তি প্রাপ্ত হয়" সেইরূপ গম্ভীরা ও তেজস্বিনী হইতে লাগিলেন। প্রেমময়ী জ্ঞানময়ী হইলেন। দেখিয়া পাপী পশুপতি ভীত ও চকিত হইল। মনোরমা সেই উন্নত অন্তঃকরণের সাহস ও গাম্ভীর্য্য লইয়া পশুপতিকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তিরস্কার করিতে করিতে যখন মনোরমা বলিলেন "শুন পশুপতি, তুমি আমার কথায় উত্তর দিলে না। আমি চলিলাম। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ইহজন্মে আমার সাক্ষাৎ হইবেক না।" তখন যেন আমরা [illegible]নোরমার জ্ঞানমূর্ত্তি পূর্ণ বিকশিত দেখিতে [illegible]ইলাম। কিন্তু উত্তেজনের পর অবসাদ[illegible], সন্তাপের পর শীতলতা; প্রকৃতির অখণ্ডনীয় নিয়ম। তাই মনোরমাকে এইরূপ অবস্থায় গমনোদ্যতা দেখিয়া পশুপতি যখন কাঁদিয়া উঠিলেন, মনোরমার জ্ঞানমূর্ত্তি দ্রব হইয়া গেল। পূর্ব্বের কঠোর কথায় আপনি কোমল হইয়া উঠিয়াছিলেন, এখন স্বামীর ক্রন্দনে একবারে আত্মহারা হইলেন। তাই পশুপতি তখন মনোরমার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন তেজোগর্ব্ববিশিষ্টা কুঞ্চিত-

ভ্রূবীচিবিক্ষেপকারিণী সরস্বতী মূর্ত্তি আর নাই। কুসুমকুমারী বালিকা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে রোদন করিতেছে।”

প্রৌঢ়া তরুণী হইল, সেই তরুণী প্রৌঢ়া হইল—আবার প্রৌঢ়া তরুণী হইল। মনোরমা বহুরূপিণী নয় কি? মনোরমা প্রহেলিকা নয় কি?

২। হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের সহিত কথোপকথনান্তে মৃণালিনী-চিন্তায় অধীর হইয়া অনন্যমনে তাহাই পর্য্যালোচনা করিতেছেন। মৃণালিনীকে ভ্রষ্টাচারিণী মনে করিয়া তাঁহার হৃদয় শত সহস্র বৃশ্চিক-দংশন অনুভব করিতেছে। এমত সময়ে মনোরমা তথায় উপস্থিত হইলেন। হেমচন্দ্রকে মনোরমা প্রথমাবধিই ভ্রাতৃবৎ স্নেহ করিয়া আসিতেছেন, অদ্য হেমচন্দ্রকে তদ্রূপ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ‘ভাই আজ তুমি কেমন আছ?’ হেমচন্দ্র উত্তর করিলেন, ‘কেমন আছি?’ মনোরমা কহিলেন, ‘তোমার মুখখানা শ্রাবণের আকাশের মত অন্ধকার; ভাদ্রমাসের গঙ্গার মত রাগে ভরা; অত ভ্রূকুটি করিতেছ কেন? চক্ষে পলক নাই কেন? আর দেখি—তাই ত, চোখে জল, তুমি কেঁদেছ? যেমন চরিত্র তেমনি কথা। কেমন স্নেহময়ী ভগিনী অথচ বালিকার ন্যায় কথা! হেমচন্দ্র এসব কথায় কোন উত্তর করিতে সহসা প্রস্তুত হইলেন না।

ইহাতে “মনোরমা প্রথমে কিছু বলিলেন না—পরে আপনা আপনি মৃদু মৃদু কথা কহিতে লাগিলেন। ‘কিছু না।—বলিবে না? ছি! ছি! বুকের ভিতর বিছা পুষিবে?’ বলিতে বলিতে মনোরমার চক্ষু দিয়া এক বিন্দু বারি বহিল।”

এই মৃদু মৃদু কথাও যেমন সুন্দর, ঐ এক বিন্দু বারিও তেমনি সুন্দর। মনোরমার কথায় কার্য্যে কি সুন্দর মিলন হইল।

“ছি! ছি! বুকের ভিতর বিছা পুষিবে?” কথাটি হেমচন্দ্রকে উপলক্ষ করিয়াই মনোরমার মুখ হইতে বাহির হইল সত্য, কিন্তু কথাটি ফিরিয়া গিয়া নিজের অন্তরপ্রদেশে বিদ্ধ হইল। মনোরমা বুকের ভিতর বিছাই পুষিয়া রাখিয়াছিলেন। সে বিছা পোষার কষ্ট মনোরমা বিশেষ জ্ঞাত আছেন। কথাটি তাঁহার অন্তস্থল ত ভেদ করিবেই। তাই হেমচন্দ্রের কথা ভাবিতে ভাবিতে সঙ্গে সঙ্গে নিজের কথাও অজ্ঞাতসারে উপস্থিত হইল; মনোরমার চক্ষু হইতে ‘একবিন্দু’ বারি বহিল। একবিন্দু? হাঁ তাহাই ত হইবে। অজস্র অশ্রুধারা বর্ষণ অসংযত চিত্তের লক্ষণ—যে আত্মসংযম করিতে পারে না, সেই বালকের ন্যায় কাঁদিয়া সুখলাভ করে। মনোরমা চিত্ত সম্বন্ধে বালিকা নহে—মনোরমার চক্ষু দিয়া যে বারিবিন্দু বহির্গত হইল, তাহা বারি নহে, মন্দারপর্ব্বতঘর্ষণে সাগর-সমুত্থিত হলাহলবিন্দু। সমস্ত অন্তস্থল পেষণ করিয়া তাহা বাহিরে প্রকাশিত হইল। মনোরমার চক্ষের জল এইরূপ এক ফোঁটা বই বহিতে জানে না। কিন্তু সে ত চক্ষের জল নয়, হৃদয়ের রক্ত। এইখানেই মনোরমা ভাবান্তর প্রাপ্ত হইতেছিলেন, কিন্তু সে ভাব সহসা প্রকাশ করিলেন না। তিনি বাহিরে পূর্ব্বের ভাব দেখাইয়া হেমচন্দ্রকে

তাঁহার দুঃখের কারণ বলিতে বড়ই পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলেন। হেমচন্দ্র সুস্থ রহিতে না পারিয়া যখন কহিলেন "আমার দুঃখ কি? দুঃখ কিছুই না। আমি মণি-ভ্রমে কালসাপ কণ্ঠে ধরিয়াছিলাম, এখন তাহা ফেলিয়া দিয়াছি।' তখন—

"মনোরমা আবার পূর্ব্ববৎ হেমচন্দ্রের প্রতি অনিমিক্‌চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে তাঁহার মুখমণ্ডলে অতি মধুর, অতি সকরুণ হাস্য প্রকটিত হইল। বালিকা প্রগল্‌ভতা প্রাপ্ত হইলেন। মনোরমা কহিলেন 'বুঝিয়াছি। তুমি না বুঝিয়া ভালবাস, তাহার পরিণাম ঘটিয়াছে।"

হেমচন্দ্রের কথায় মনোরমার বিছা পোষার কথা মিলিয়া গেল। হেমচন্দ্র প্রণয়ের কথাই ভাবিতেছেন। যে শাস্ত্রে মনোরমা অদ্বিতীয়া জ্ঞানবতী, হেমচন্দ্র আজি তাহারই কথা মনোরমার সম্মুখে উত্থাপিত করিলেন। মনোরমা হেমচন্দ্রের প্রতি অমিমিক্‌চক্ষে চাহিয়া রহিলেন। এই সময়ে তাঁহার প্রখরা বুদ্ধিবৃত্তি হেমচন্দ্রের কথা, হেমচন্দ্রের হৃদয় একবার সমালোচনা করিয়া লইল। সমালোচনা শেষ হইয়া যখন মনোরমা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন, তাঁহার মুখমণ্ডলে হর্ষ-চিহ্ন প্রকাশিত হইল—অতি মধুর, অতি সকরুণ হাস্য প্রকটিত হইল। হর্ষ, হেমচন্দ্রের দুঃখের কারণ আবিষ্কার জন্য—সকরুণ হাসি, হেমচন্দ্রের ভ্রান্তিজনিত কষ্টে সমবেদনা জন্য। প্রণয়শাস্ত্রে মনোরমা অধ্যাপক, হেমচন্দ্র বালক মাত্র। সেই বালকের ভ্রান্তিতে মনোরমার হাসি আসিল, কিন্তু ভ্রান্তি হউক, তজ্জন্য হেমচন্দ্র যে কষ্ট পাইতেছেন, তাহা দেখিয়া হাসিটি সকরুণ হইয়া ফুটিয়া পড়িল। কবিত্ব কাহাকে বলে দেখিলে?

ক্রমে মনোরমার বর্ণ পরিবর্ত্তিত হইতে লাগিল। যেমন শাদা জলে কোন প্রকার রঙ ফেলাইয়া দিলে আস্তে আস্তে সমস্ত জলই সেই রঙে রঞ্জিত হইয়া উঠে, মনোরমারও তদ্রূপ ঘটিল। মন, শরীর, প্রকৃতি ধীরে ধীরে জ্ঞানজ্বালায় বিভাসিত হইল। মনোরমা ভাবান্তর প্রাপ্ত হইলেন।

এই স্থলটি উদ্ধৃত করিয়া দিবার প্রলোভন অতি কষ্টে সম্বরণ করিতে হইল। পাঠকগণ একবার 'আমি ত উন্মাদিনী' অধ্যায়টি এই সময়ে পড়িয়া লইবেন। প্রৌঢ়া মনোরমা এইখানে বড়ই খুলিয়াছে। এইখানেই মনোরমা তাঁহার জীবনব্যাপিনী শিক্ষার পরিচয় দিয়াছেন। অধ্যায়টি উচ্ছাসপূর্ণ!

পাঠকগণ এই অধ্যায়টি নূতন করিয়া পড়িয়া লইয়াছেন, এই ভাবিয়া এ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিব। এ অপরাধটুকু তাঁহারা ক্ষমা করিবেন।

যখন হেমচন্দ্র (মৃণালিনী সম্বন্ধে) কহিলেন 'ভাল বাসিতাম।' ঐ দেখ মনোরমা কি বলিয়া আপন সুন্দর অলকদাম সুন্দর চম্পকঅঙ্গুলিতে জড়িত করিয়া টানিতে লাগিল। কি সুন্দর বিরক্তি প্রকাশ—কি সুন্দর অসন্তোষ প্রকাশ!—মনোরমার সকল কার্য্যই মনোরম! আবার ঐ দেখ, কথা বলিতে বলিতে মনোরমা কিরূপ বাগ্মী হইয়া উঠিলেন—ঐ দেখ মনোরমার চক্ষু কেমন জ্বলিতেছে—স্বর কেমন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে—আকৃতি কেমন জ্ঞানময়ী হইয়া উঠিতেছে।

"দেখিয়া হেমচন্দ্র বিস্মিত হইয়া ভাবিলেন, আমি ইহাকে একদিন বালিকা মনে করিয়াছিলাম!"

বালিকাভাব দেখিয়াছ, এইখানে প্রৌঢ়াভাব দেখিয়া লও। সরলতা দেখিয়াছ, এইখানে শিক্ষা দেখিয়া লও। প্রেম দেখিয়াছ, এইখানে জ্ঞান দেখিয়া লও।

পাপাসক্তকেও কি ভাল বাসিতে হইবে?—যখন হেমচন্দ্র মনোরমার নিকটে এই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলেন, মনোরমা সহসা কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। "ইহার উত্তর মনোরমার উপদেষ্টা বলিয়া দেন নাই। উত্তর জন্য আপনার হৃদয়মধ্যে সন্ধান করিলেন; অমনি উত্তর আপনি মুখে আসিল।" এইস্থল একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। মনোরমার উপদেষ্টা কে, বোধ হয় তাহা পাঠকবর্গ অবগত আছেন। পাপাসক্তকে ভালবাসিতে হইবে কি না, এ কথা তিনি মনোরমাকে শিখাইয়া দেন নাই। এ কথা তিনি শিখাইতে পারেন না। কিন্তু নাই শিখান, মনোরমার হৃদয়ে এ কথার উত্তর গাঁথা ছিল। এ প্রশ্ন তাঁহার নিকট নূতন বলিয়া বোধ হইল না। অবস্থাধীন পশুপতি যাহার প্রণয়পাত্র, তাহার নিকট এ প্রশ্নের উত্তর সহজেই আসিল।

অন্যত্র হেমচন্দ্র যখন মনোরমাকে তাঁহার মতে পাপ-প্রণয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য গুরুগম্ভীরভাবে উপদেশ প্রদান করিলেন।

"মনোরমা উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন পরে মুখে অঞ্চল দিয়া হাসিতে লাগিলেন—হাসি বন্ধ হয় না।"

কি সুন্দর মনোরমা খুলিল। প্রণয়ী মনোরমা, জ্ঞানী মনোরমা, বালিকা মনোরমা একত্র মিশ্রিত হইয়া এইহাস্যে বিরাজ করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র অপ্রস্তুত হইলেন। শেষে যখন কথার বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ হইল—মনোরমা যখন দেখিলেন, তাঁহার অন্তরের একটি গোপনীয় কথা বাহির হয় হয় হইতেছে তখন তিনি তাঁহার অন্তরের কবাট, জ্ঞানের কবাট, বন্ধ করিয়া দিলেন—বাহিরে বালিকা মনোরমা হেমচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল—

'ভাই হেমচন্দ্র,এ ঢাল কিসের চামড়া?

কি অপূর্ব্ব ভাবান্তরে কি অপূর্ব্ব কবিত্বই দেখিলাম!

এ সকল তবু এক রকম বুঝান যায়। কিন্তু সেই মনোরমার কথা—'কিন্তু আমি ত উন্মাদিনী' বুঝাইয়া উঠা যায় না। কথা কহিতে কহিতে মনোরমা যেন হৃদয়স্থ অনন্ত প্রণয়-সমুদ্র দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সিহরিয়া উঠিলেন—যত্নে লুক্কায়িত হৃদয়-মন্দিরের চিরাবদ্ধ দ্বারদেশ হঠাৎ উন্মুক্ত-প্রায় দেখিয়া সহসা যেন ঈষৎ চমকিত হইয়া উঠিলেন—নিজের আত্মসংযমের মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছেন দেখিয়া সহসা যেন বিস্মিত হইয়া উঠিলেন। নিজের হৃদয়ের কথা নিজেই জানিতে পারিয়া যেন ক্ষণিক আত্মহারা হইয়া সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইলেন। তাই উক্ত কথা কয়টি মুখ দিয়া বহির্গত হইল। কথাগুলিতে মনোরমার হৃদয়ের দ্বার বন্ধ করিল, স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া ফেলিল—তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিল। ইহার পরেও মনোরমা প্রণয়ের কথা কহিয়াছেন, কিন্তু এরূপ ভাবে আর না। আবার যখন উচ্ছ্বাসের সময় আসিল

বুদ্ধিমতী মনোরমা সকল কথা চাপা দিলেন; বলিলেন—

'ভাই এ ঢোল কিসের চামড়া?'

এ হেন মনোরমা বহুরূপিণী নয় কি?

৩। আর একদিন মনোরমা পশুপতির অষ্টভুজা-মন্দিরে পূজাবশিষ্ট কতকগুলি ফুল লইয়া বিনাসূত্রে মালা গাঁথিতেছেন—পশুপতি প্রণাম বন্দনাদির জন্য দেবীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া মনোরমাকে দেখিতে পাইলেন। পশুপতি কহিলেন, 'মনোরমা কখন আসিলে?,—মনোরমা কথার কোন উত্তর দিলেন না। পশুপতি কহিলেন 'আমার সঙ্গে কথা কও। যতক্ষণ তুমি থাক ততক্ষণ সকল যন্ত্রণা বিস্মৃত হই।'

"মনোরমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিলেন। পশুপতির মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন, ক্ষণেক পরে কহিলেন, 'আমি তোমাকে কি বলিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমার মনে হইতেছে না।' কি বলিতে মনোরমা এখানে আসিয়াছিলেন, পাঠক বলিতে পার? মনোরমা মুগ্ধ হইয়া পশুপতির সে দিন পাপ-পথে অগ্রসর হইবার একমাত্র বাধাটি অপসারিত করিয়াছিলেন, মনোরমার সে মোহ কিন্তু অধিক সময় ছিল না। মোহান্তে মনোরমা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কাজটি তাঁহার পক্ষে ভাল হয় নাই; আজ মনোরমা তাহাই কি পশুপতিকে বলিতে আসিয়াছিলেন? পশুপতিকে পাপপথ-প্রত্যাবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিবেন, ইহা মনে করিয়াই কি মনোরমা অদ্য এখানে আসিয়াছিলেন? পশুপতি মনোরমার প্রণয়-পাত্র। প্রণয়-পাত্রের নিকটে কত কথা বলিবার থাকে; বিশেষতঃ মনোরমার ত কথাই নাই, তাঁহার আকণ্ঠ কথায় ভরা। তাহারই কি কোন কথা পশুপতিকে বলিবার জন্য অদ্য মনোরমা আসিয়াছিলেন? যে কথাই বলিবার জন্য আসুন না কেন, মনোরমা বলিতে পারিলেন না কেন? পশুপতির মুখপ্রতি চাহিয়াই কি মনোরমা সব ভুলিয়া গেলেন? তাহাই বটে। পূর্ণমাত্রায় দুই ইন্দ্রিয়ের কাজ একবারে চলে না।

পশুপতি বসিয়া রহিলেন, নিজে কত বকিলেন, মনোরমাকে কত বুঝাইলেন। কিন্তু বুঝিবে কে?—বালিকা মনোরমা? বালিকা মনোরমা পশুপতির কূটতর্ক কি বুঝিবে? তাই পশুপতি আজ প্রৌঢ়া মনোরমাকে চাহিতেছেন। এজন্য, তিনি কত কৌশল-অবলম্বন করিলেন। প্রথমে কহিলেন, 'আমি শয়নে যাই'—মনোরমা অম্লানবদনে কহিলেন, 'যাও'। কত ভয় দেখাইলেন, কিছুতেই মনোরমার বুদ্ধি প্রদীপ জ্বলিল না। জ্বলিল না কি? মনোরমা তখন বুদ্ধিপ্রদীপে অন্তর আলোকিত করিয়া তাহারই প্রত্যেক স্থান তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষা দেখিতেছেন; বাহিরে বিনাসূত্রে মালা গাঁথিতেছেন। কিন্তু মনোরমার বিনাসূত্রে ত মালা গাঁথা হইল না—মনোরমার ন্যায় রমণী বিনাসূত্রের মালা অন্যকে পরাইতে জানে না। এবারে সূত্র লইয়া মালা গাঁথা আরম্ভ হইল। বাহিরে এই, কাজ—অন্তরে, ঐ চিন্তা।

পশুপতি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি আমাকে কি বলিতে মন্দিরে আসিয়াছ?' মনোরমা কহিলেন, 'দেবতা প্রণাম করিতে।' গোল ফুরাইয়া গেল।

"পশুপতি বিরক্ত হইলেন। কহিলেন 'তোমাকে মিনতি করিতেছি, মনোরমে, এইবার যাহা বলিতেছি, তাহা মনোযোগ দিয়া শুন, তুমি আজিও বল, আমাকে বিবাহ করিবে কি না ?"

মনোরমা তখন একটা বিড়ালের গলায় মালা পরাইতেছিলেন। বিড়াল মালা পরিবে কেন ? পরিশেষে, সেই ছেঁড়া মালা পশুপতির গলদেশেই শোভা করিল। মনোরমা বিবাহসূত্রে গাঁথা প্রণয়ের মালা পশুপতিকে পরাইলেন। পশুপতি কিছু বুঝিলেন না। নাই বুঝুন সেই সময়কার মনোরমার চিত্তভাব যেরূপ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া বাহিরে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা দেখিয়া তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল।

"তিনি মনোরমাকে আলিঙ্গন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিলেন—অমনি মনোরমা লম্ফ দিয়া দূরে দাঁড়াইলেন—পথিমধ্যে উন্নতফণা কালসর্প দেখিয়া, পথিক যেমন দূরে দাঁড়ায়, সেইরূপ দাঁড়াইল। পশুপতি অপ্রতিভ হইলেন; ক্ষণেক মনোরমার মুখের প্রতি চাহিতে পারিলেন না; পরে চাহিয়া দেখিলেন,—মনোরমা প্রৌঢ়বয়সী মহিমাময়ী সুন্দরী। পশুপতি কহিলেন, মনোরমে, দোষ ভাবিও না। তুমি আমার পত্নী—আমাকে বিবাহ কর।' মনোরমা পশুপতির মুখপ্রতি তীব্র কটাক্ষ করিয়া কহিলেন,—

'পশুপতি! কেশবের কন্যা কোথায় ?'

পাঠক, মনোরমার এ অপূর্ব্ব ভাবান্তরের কারণ বুঝিলে কি ? যাই পশুপতি মনোরমাকে আলিঙ্গন জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন, অমনি বালিকা মনোরমার হৃদয়ের দ্বার বন্ধ হইল; প্রৌঢ়া, জ্ঞানী মনোরমা বাহিরে উপস্থিত হইলেন। যখন যাহার আবশ্যক, যে সময়ের যাহা, এক মনোরমা হইতে সে সময়ে তাহাই প্রকাশিত হয়। অদ্য পশুপতি আত্মসংযমে অপারগ হইয়া তাঁহার বিবেচনায় বিধবা রমণীকে আলিঙ্গন করিতে হস্ত প্রসারণ করিতেছেন—হিন্দুরমণী মনোরমা পতিকে এ হেন কুকার্য্য করিতে কি প্রশ্রয় দিতে পারে ? আর হিন্দুরমণী কি কুলটা বলিয়া পরিচিতা হইয়া পতির সোহাগ কামনা করিতে পারে ? তাই মনোরমা অমন চকিত হইয়া ফিরিলেন। জ্যোতির্ব্বিদের কথাটিও তখন মনে হইয়া থাকিবে। এ সকলই পূর্ব্বচিন্তিত কথা—পশুপতি সহিত মনোরমা যখন অত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া গিয়াছেন, তখন পশুপতি ঐরূপ অধীর হইলে, মনোরমা কিরূপ কার্য্য করিবেন, তাহা মনোরমার স্থিরই রহিয়াছে। সেই সিদ্ধান্ত, কার্য্যে পরিণত করিবার সময় উপস্থিত হইল, তাই মনোরমা চকিতের ন্যায় পশুপতির নিকট হইতে সরিয়া গেলেন। পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত না থাকিলে, আত্মসংযমী মনোরমার পক্ষে, পশুপতির এ উচ্ছ্বাসের সময় স্থির থাকা কষ্টকর হইত। কিন্তু পশুপতির উক্তকার্য্যে তাহার অন্তরস্থ জ্ঞানপ্রদীপ হঠাৎ বাহিরেও জ্বলিল; কারণ, বাহিরে তাহার কার্য্যের সময় উপস্থিত।

এ হেন মনোরমা প্রহেলিকা নয়ত কি ?

প্রস্তাবটি কিছু দীর্ঘ হইয়া পড়িল।

এখন আমরা পশুপতি-প্রতি মনোরমার প্রণয় সম্বন্ধে দুই একটি স্থূল কথা বলিয়াই প্রস্তাব শেষ করিব।

পশুপতির প্রতি মনোরমার প্রণয় যে মনোরমা-চরিত্র গঠনের একটি অতি প্রধান উপাদান, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। কবি এই প্রণয় মৃণালিনীর "মোহিনী" ও "মোহিতা" শীর্ষক অধ্যায়-দ্বয়ে অতি সুন্দররূপে প্রদর্শিত করিয়াছেন। সে স্থানগুলি পূর্ব্বেই কিছু কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা তাহা এ স্থলে পুনরুদ্ধৃত না করিয়া, পাঠকবর্গকে স্মরণ করিয়া দেখিতে বলিব। পশুপতির পাপসঙ্কল্পের কথা জানিয়া মনোরমা সাধ্বী পত্নীর ন্যায় প্রথমে তাঁহাকে অনুনয় বিনয়, গঞ্জনা, তিরস্কার, ঘৃণা, ভয় প্রদর্শন, দ্বারা সৎপথে আনিতে চেষ্টা করিলেন। সৎপথে না আসিলে, পশুপতির সহিত আর কখনও দেখা করিবেন না, প্রতিজ্ঞা করিলেন। কিন্তু পশুপতি ইহাতে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, যাই স্ত্রীলোকের ন্যায় মনোরমার হাত ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, প্রেমিকা হিন্দু-পত্নী মনোরমা পূর্ব্বের কথা সব ভুলিয়া গেলেন—পশুপতির কার্য্যের ঔচিত্যানৌচিত্য ভুলিয়া গেলেন। তখন আর পশুপতিকে বাধা দিয়া কষ্ট দিতে তাঁহার ক্ষমতা রহিল না। যেন স্বামীর কষ্ট—প্রকৃতই হউক কি কল্পিতই হউক, ন্যায়ই হউক কি অন্যায়ই হউক,—দূর করাই তাঁহার প্রথম কর্ত্তব্য হইয়া পড়িল। ভালবাসার বল দেখিলে? অমন স্থিরা মনোরমার প্রতিও ইহার ক্ষমতা দেখিলে?

পশুপতি পরম পাপী। মনোরমা পুণ্যবতী সাধ্বী। এই পাপীর প্রতি এই সাধ্বীর প্রণয় কি সুন্দর নহে? পশুপতি মনোরমার স্বামী। স্বামী চোর হউক, ডাকাত হউক, প্রবঞ্চক হউক—শাস্ত্রানুসারে হিন্দুরমণীর পরম পূজ্য। মনোরমা হিন্দুপত্নী—তবে কেন সে পশুপতির প্রতি অনুরাগিণী না হইবে? হিন্দু-শাস্ত্রের এই আদেশের তাৎপর্য্যও মনোরমাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

এই পশুপতির প্রতি তাঁহার ভালবাসা স্থির রাখিতে গিয়া, প্রণয় সম্বন্ধে মনোরমা কত গভীর তত্ত্ব, কত সার কথা শিখিয়াছে —মুখে শেখা নয়, কার্য্যে পরিণত করিতে শিখিয়াছে, শুনিয়াছ? এই শুন, হেমচন্দ্রের সহিত কথোপকথনে মনোরমা বলিতেছে;—

"এ কেবল বীরদম্ভকারী পুরুষদের দর্পমাত্র। অহঙ্কার করিয়া আগুন নিবান যায়? তুমি বালির বাঁধ দিয়া এই কূল-পরিপ্লাবিনী গঙ্গার বেগ রোধ করিতে পারিবে, তথাপি প্রণয়িনীকে পাপিষ্ঠা মনে করিয়া কখনও প্রণয়ের বেগ রোধ করিতে পারিবে না।"

"পাপাসক্তকে ভাল বাসিতে হইবে। প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভাল বাসিবে, প্রণয় জন্মিলেই তাহাকে যত্নে স্থান দিবে, কেন না প্রণয় অমূল্য। ভাই, যে ভাল, তাকে কে না ভালবাসে? যে মন্দ, তাকে যে আপনা ভুলিয়া ভালবাসে, আমি তাকে বড় ভালবাসি।"

আর কত উদ্ধৃত করিব? ইহাতে মনোরমার প্রণয়ের প্রকৃতি অতি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। মনোরমার ভালবাসা আদর্শ ভালবাসা—সম্পূর্ণ

সংস্কৃত ও বিকশিত। মনোরমাই যথার্থ ভালবাসার তত্ত্ব অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। এই ভালবাসা হইতেই সর্ব্বভূতে ভালবাসা জন্মিয়া থাকে। তাই হিন্দু শাস্ত্রের এইরূপ আদেশ। পাপাসক্তকে ভালবাসা সহজ কথা নহে।

মনোরমা স্বামীকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভালবাসিত। কিন্তু তবু পশুপতিকে তাঁহার কোনরূপ অন্যায় অভিলাষ পূরণ করিতে দেয় নাই। পশুপতি এক দিন যখন উন্মত্তপ্রায় হইয়া মনোরমাকে আলিঙ্গন করিতে বাহু প্রসারণ করিয়াছিল, "মনোরমা লম্ফ দিয়া দূরে দাঁড়াইল—পথিমধ্যে উন্নতফণা কালসর্পদেখিয়া পথিক যেমন দূরে দাঁড়ায়, সেইরূপ দাঁড়াইল।" পশুপতি মনোরমাকে অন্য পত্নী বোধে আলিঙ্গন করিতে অগ্রসর—মনোরমা স্বামীর এ পাপ কার্য্যে বাধা জন্মাইল। ধীরে ধীরে স্বীয় পরিচয় প্রদান করিল। মনোরমার সংযম দেখিলে? মনোরমার এ প্রণয়ে শারীরিক সম্বন্ধ নাই। এ প্রণয় অতি নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ।

আর একটি কথাই বলিয়াই উপসংহার করিব। মনোরমার পরিণামটি একবার ভাবিয়া দেখিব। এইরূপ ভালবাসার কি এই পরিণাম! বাস্তবিক প্রথম দৃষ্টিতে ইহা কিছু কষ্টদায়ক বটে; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই এ কষ্ট আর থাকিতে পারে না। ভগবানের নিয়ম সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ—কদাচ তাহা অন্যথা হইবার নহে। পাপী, পুণ্যবাণের প্রণয়-পাত্র হইলেও শাস্তি বিমুক্ত হইতে পারে না। তাই পশুপতি মনোরমার স্বামী হইয়াও পতঙ্গবৎ অগ্নি মধ্যে নিনষ্ট হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনোরমাও ত পুড়িয়া মরিলেন? মরিবেন বই কি? মনোরমা স্বীয় অদৃষ্ট বশতঃ (জ্যোতির্ব্বিদের: গণনায় কথার কৌশল আর একবার দেখ) পাপীর সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে যখন প্রাণ তুল্য ভাল বাসিয়াছেন, তখন তাঁহাকে একেবারে শাস্তিমুক্ত করা ও ঈশ্বরের অভি প্রায় ছিল না। তাই মনোরমাও পুড়িয়া মরিলেন। কিন্তু সে পোড়া পশুপতির মত নহে। পশুপতির মৃত্যু যন্ত্রণাময়, মনোরমার মৃত্যু সুখময়। একজন হাসিতে হাসিতে, আর একজন কাঁদিতে কাঁদিতে ইহলোক ছাড়িয়া গেলেন। একজন পাপ কার্য্য দ্বারা কর্ম্ম বাড়াইয়া গেলেন, অন্য জন দুঃখাদি ভোগ দ্বারা কর্ম্মফল খণ্ডন করিয়া গেলেন। এক জন মৃত্যুর পরে ইহলোকে চিরদিন নিন্দা ভাজন হইয়া রহিলেন, অন্য জন মৃত্যুতে চিরকাল যশোভাজন হইয়া রহিলেন। প্রভেদ এতটা। প্রভেদ যাই হউক, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধটা বিস্ময়কর।

২। পশুপতি।

"মৃণালিনীতে" পশুপতির যে জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, তাহা মোটামুটিচারি ভাগে বিভাগ করা যায়। প্রথম ভাগে, পশুপতির সংক্ষিপ্ত পূর্ব্ব পরিচয়, দ্বিতীয় ভাগে, পশুপতির দুরাকাঙ্ক্ষা, সৎবৃত্তির সহিত সেই দুরাকাঙ্ক্ষার বিরোধ এবং পরিণামে দুরাকাঙ্ক্ষার জয়, তৃতীয় ভাগে সেই দুরাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্তির জন্যপশুপতির কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ ও কার্য্যের পরিণাম

এবং চতুর্থ ভাগে পশুপতির পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রথমভাগ। পূর্ব্ব পরিচয়।

পশুপতির পূর্ব্ব পরিচয় অতি সংক্ষিপ্ত। গ্রন্থকার ৩৪ ছত্রে তাহা পাঠকবর্গকে জ্ঞাত করাইয়াছেন; কিন্তু তবু তাহা জানা আবশ্যক। সেই ৩৪ ছত্রের মধ্যেই একটি কাব্য-কৌশল প্রদর্শিত হইয়াছে। পরিচয়টি এইরূপ ;—

"পশুপতি জাতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি কোথা, তাহা কেহ বিশেষ জ্ঞাত ছিল না। কথিত ছিল যে, তাঁহার পিতা শাস্ত্রব্যবসায়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। পশুপতি কেবল আপন বুদ্ধি বিদ্যার প্রভাবে গৌড়রাজ্যের প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।"

পশুপতির আকৃতি বর্ণনাও এইখানে উদ্ধৃত করিলাম,—

"পশুপতির বয়ঃক্রম পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর হইবে। তিনি দেখিতে অতি সুপুরুষ। তাঁহার শরীর দীর্ঘ, বিশাল, সর্ব্বাঙ্গ অস্থিমাংসের সংযোগে সুন্দর। তাঁহার বর্ণ তপ্তকাঞ্চন সন্নিভ; ললাট অতি বিস্তৃত, মানসিক শক্তির মন্দির স্বরূপ। নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত,চক্ষু ক্ষুদ্র, কিন্তু অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য সম্পন্ন। মুখকান্তি জ্ঞান গাম্ভীর্য্য-ব্যঞ্জক এবং অনুদিন বিষয়ানুষ্ঠানজনিত চিন্তার গুণে কিছু পরুষভাবব্যঞ্জক।"

ইহার পরে, পশুপতির বিবাহের কথা যোগ করিলেই পূর্ব্ব পরিচয়টি শেষ হয়। সে কথা স্থানান্তরে বলা হইয়াছে। এ স্থলে, এখন ইহাই বলা আবশ্যক যে, এই পঞ্চত্রিংশৎ বৎসর পর্য্যন্ত পশুপতিপত্নীসহবাসে বঞ্চিত।

এইরূপ পূর্ব্বপরিচয়টি পাঠ করিয়া, আমরা জানিতে পারিলাম, পশুপতি প্রথমে নিতান্ত দরিদ্রাবস্থার লোক ছিলেন। উন্নতির পরে উন্নতিতেই তিনি ধর্ম্মাধিকার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। কথাটি পড়িয়াই মনে হইল, গ্রন্থকার অনর্থক এ পরিচয়টি প্রদান করেন নাই। এরূপ পূর্ব্ব পরিচয়ে তাঁহার যথেষ্ট কৌশল প্রকাশিত হইয়াছে, এতদ্দ্বারা পশুপতির আকৃতি বর্ণনা পাঠ করিলাম। দেখিলাম সুন্দর একটি রাজনৈতিকের আকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। রাজনৈতিকের কথা মনে হইলেই তৎসঙ্গে আরও দুই একটি কথা মনে হয়। ভরসা করি, উনবিংশ-শতাব্দীর পাঠকবর্গ তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। একে রাজনৈতিক, তাহে চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র, মনে মনে পশুপতির সচ্চরিত্রে বড়ই সন্দেহ জন্মিল। পূর্ব্বের তত্ত্বটিও এই সন্দেহ নিরাকরণ না করিয়া বরং পরিবর্দ্ধিত করিল। আমরা সন্দিগ্ধ-চিত্তে পশুপতির কার্য্যাবলী পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অনেকক্ষণ পরীক্ষা করিতে হইল না। অল্প পরেই সব বুঝিলাম—বুঝিলাম যে, বিশ্বাসঘাতক, শরণাগত অতিথির প্রাণগ্রহণে প্রস্তুত, প্রতিপালক প্রভুর, রাজ্যাপহরণাভিলাষী, কূটবুদ্ধি, সুচতুর পশুপতি সম্বন্ধে কথাগুলি বড়ই সুন্দরভাবে লিখিত হইয়াছে। চারিদিকে দৃষ্টি পড়িল—কত জীবন্ত ঘটনা স্মৃতিপথে উদ্রিক্ত হইল ; দেখিলাম, এইরূপ নীচাবস্থা হইতে যাহারা ক্রমে বড় হইয়া উঠে, এরূপ কুমতি তাহাদের পক্ষে

হওয়া অসম্ভবপর নহে। অনেক স্থলেই এরূপ ব্যক্তিকে শেষে আশার সর্ব্বশেষ সোপানে অধিরূঢ় দেখিতে পাওয়া যায়—উন্নতিপ্রদাতা প্রভুর সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত দেখা যায়। ইতিহাসও এইরূপ। এই-স্থলে মাক্‌বেথ-কাহিনী মনে পড়িল; সেখানেও প্রায় এই কথা। মাক্‌বেথে সেই ডাকিনীগুলার অবতারণে ও ক্রমিক পদোন্নতিতে মাক্‌বেথের দুরাশা পরিবর্দ্ধিত; ঘটনাগুলি কিছু জাঁকাল; এখানে এই তিন চারি ছত্রে পশুপতির দুরাশার ক্রমশঃ বৃদ্ধির সম্ভাবনা—কৌশলে ও সংক্ষেপে পরিব্যক্ত। আমাদিগের কবি এতদ্ভিন্ন সেই দুরাশা সঞ্চারের কারণ বর্ণন জন্য কোন ঘটনাও সৃষ্টি করেন নাই, কোন বিশেষ কথাও বলিয়া দেন নাই। ইঙ্গিতে কার্য্য শেষ করিয়াছেন। মাক্‌বেথের সহিত ইহার তুলনা করিতেছি না; কারণ, এখানে মাক্‌বেথের কবির যাহা চেষ্টা, আমাদিগের কবির ঠিক্ সেইরূপ চেষ্টা নহে। আমরা কবির কৌশল মাত্র প্রদর্শন করিলাম। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল, না জানি এরূপ কত সারগর্ভ সুন্দর কথা আমরা উপেক্ষা করিয়া যাইয়া থাকি। যাঁহারা এত ভাবিয়া লেখেন, তাঁহাদের গ্রন্থ আমরা ভাবিয়া পড়ি না কেন?

পশুপতির বয়ঃক্রম এক্ষণে পঞ্চত্রিংশ বৎসর। পূর্ণ যৌবন। কিন্তু এই পঞ্চত্রিংশ বৎসর পর্য্যন্ত পশুপতি পত্নীসহবাসে বঞ্চিত। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিপালনে এরূপ হয় নাই, বাল্যকালেই পশুপতির বিবাহ হইয়াছিল। ধন-মর্য্যাদার অভাবে এরূপ ঘটে নাই, পশুপতি গৌড়ের সর্ব্বপ্রধান পদে অধিষ্ঠিত। বিষয়-কার্য্যে ব্যাপৃত ও পাপ-প্রণয়াসক্ত বলিয়া পশুপতি এ কাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই। পশুপতি হিন্দু সন্তান, জাতিতে ব্রাহ্মণ—মনোরমা নাম্নী বিধবা বলিয়া পরিচিতা একটি কামিনী তাঁহার প্রণয়-ভাগিনী। কবি এখানেও পশুপতিতে পাপমতিপরায়ণ এবঞ্চ কূটবুদ্ধিপ্রবৃত্ত করিয়া পাঠকবর্গ সমীপে উপস্থাপিত করিয়াছেন। এখনকার অবশিষ্ট বক্তব্য এই যে, এরূপ লোকের সুপত্নী হইলে, (মাক্‌বেথের মত পত্নী নহে) যে টুকু সুফল প্রত্যাশা করা যায়, তাহাও আমরা আশা করিতে পারিলাম না। দুর্ভাগ্যক্রমে পশুপতি সেরূপ সুপত্নী হইতে বঞ্চিত; সুপত্নী থাকিয়াও তাঁহার পক্ষে ছিল না। হায় রে দুরদৃষ্ট!

দ্বিতীয় ভাগ। দুরাশার সঞ্চার—সদ্বৃত্তির সহিত দুরাশার বিরোধ—আত্মপ্রতারণা—দুরাশার জয় লাভ।

এই দ্বিতীয় ভাগে পশুপতি একটি ভয়ঙ্করী দুরাশা লইয়া আমদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সেই দুরাশার প্রথম সঞ্চারের কথা বা তাহার ক্রমবিকাশের কথা, আমরা গ্রন্থ মধ্যে বড় একটা দেখিতে পাই না। যাহা কিছু পাইয়াছি, তাহা পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে। কিন্তু সেটা ইঙ্গিতে সম্ভাবনা ব্যক্তি মাত্র; বিশেষ কোন কথা নহে। আর যাহা কিছু আছে, পরে প্রসঙ্গ ক্রমে বলা যাইবে।

"যবন সহযোগে বৃদ্ধ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং রাজা হইব,"—এই

আকাঙ্ক্ষা লইয়াই পশুপতি এখন আমাদিগের সমীপে উপস্থিত। মুসলমান চরের সঙ্গে গোপনে কথোপকথন শেষ হইয়া গিয়াছে, ষড়যন্ত্রও একরূপ সুস্থির হইয়া গিয়াছে। এতাবৎ পশুপতির হৃদয়ে কোনরূপ সংঘর্ষণের অবস্থা প্রত্যক্ষ করিতে পাইলাম না। কিছু যে পাইলাম না, এমত নহে—মহম্মদ আলীর সহিত কথোপকথনে পশুপতির ইতস্ততঃ ভাবটা সুন্দররূপেই পরিস্ফুট আছে; কিন্তু ইহার পরে যাহা দেখিতে চাহিলাম, তাহা পাইলাম না। মনের কথা গোপন করা, রাজনীতিজ্ঞের একটি প্রধান গুণ। তাই কবি প্রথমে এটি খুলিয়া দেখান নাই। কিন্তু ইহার পরে দেখ—পশুপতি মুসলমান চরকে বিদায় দিয়া, স্বীয় স্থাপিত অষ্টভূজা প্রতিমাগ্রে যুক্ত করে স্তুতি করিয়া কহিতেছেন;—

"জননি! বিশ্বপালিনি! আমি অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলাম—দেখিও মা! উদ্ধার করিও। আমি **জননী স্বরূপা** জন্মভূমি দেবদ্বেষী যবনকে বিক্রয় করিব না। কেবলমাত্র এই আমার পাপাসক্তি যে, **অক্ষম প্রাচীন** রাজার স্থানে আমি রাজা হইব। যেমন কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিরা উভয় কণ্টককে দূরে ফেলিয়া দেয়, তেমনি আমি যবনসহায়তায় রাজ্যলাভ করিয়া রাজ্য সহায়তায় যবনকে নিপাত করিব। ইহাতে পাপ কি মা! যদি ইহাতে পাপ হয়, যাবজ্জীবন প্রজার সুখানুষ্ঠান করিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। জগৎপ্রসবিনি! প্রসন্ন হইয়া আমার কামনা সিদ্ধ কর।"

ইহাই পশুপতির দুরাশার সহিত সদ্বৃত্তির সংগ্রাম। রাজনৈতিক অনেক কথা কহে না, তাই কথাগুলি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু কত অর্থ যুক্ত! কথাগুলিতে হৃদয়ের দুই দিকই কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। পশুপতির উপযুক্ত কথা বটে।

আমরা যে সকল কথা বৃহদক্ষরে মুদ্রিত করিয়াছি! তাহা বিশেষ অর্থযুক্ত। সব কিছু ব্যাখ্যা করা যায় না, তবু দুই একটি কথা বলিব

পশুপতি স্বদেশভক্ত—জন্মভূমি তাঁহার নিকট মাতৃস্বরূপ। পশুপতি দেবভক্ত—স্বয়ং অষ্টভুজার মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া, নিত্য তাঁহার অর্চ্চনা করিতেন। যবনের বিশেষণে তিনি 'দেবদ্বেষী' বিশেষণটিই প্রয়োগ করিতেছেন। এ সকল কথা দুরাশার সম্পূর্ণ প্রতিকূলে। আবার অনুকূলেও একটা চাপা কথা বাকী আছে। রাজা 'অক্ষম প্রাচীন'। যে রাজ্যরক্ষণে অশক্ত, বিপ্লব সময়ে তাহাকে রাজা রাখা ঠিক্ স্বদেশভক্তের সঙ্গত কার্য্য নহে। তিনি রাজ্যরক্ষণে পটু, তবে তাঁহার রাজা হওয়াতে দোষ কি? কথাটি বলিয়া, পরক্ষণেই আবার পশুপতি দোষ বুঝিতে পারিলেন। যবনের সাহায্যে রাজ্যলাভ—যবনের অধীনে মাতৃভূমি রাখা! আবার তাহা দূর হইল। যেরূপ কাঁটা দিয়া কাঁটা তোলে, পশুপতি সেইরূপ যবন সহায়তায় রাজ্যলাভ করিয়া, রাজ্য সহায়তায় যবন দূর করিবেন। ইহাতে পাপ কি? কিন্তু তবু যেন পশুপতির মনে হয়, এতে পাপ আছে। তাই পশুপতি বলিতেছেন,—যদি ইহাতে পাপ হয় সে পাপ তিনি প্রজারঞ্জন করিয়া ক্ষয় করিবেন।

পাঠক, এখন দেখ দেখি, এই কয় ছত্রে পশুপতি কত কথা বলিয়াছেন। রাজনৈতিকের উপযুক্ত বাক্য নয় কি? সাবধানতা ও কৌশল দেখ।

আরও একটি কথা। পাঠক, শেক্‌পীয়রের মাক্‌বেথকে দেখিয়াছ, একবার এই হিন্দু পাপীকে দেখ! গোড়াতে মাক্‌বেথকে আমরা ভাল লোকই দেখিয়াছি; কিন্তু কই, তাহার পাপাচরণের সময়ে বা প্রারম্ভে এরূপ ত কিছু শুনিতে পাইলাম না? কারণ পরিষ্কার—মাক্‌বেথ হাজার হউক ম্লেচ্ছ—আর পশুপতি হিন্দু।

হিন্দু পাপী প্রায় ধর্ম্মের নিকট একটা জবাব না দিয়া, পাপে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। হিন্দুর ডাকাত কালী পূজা না করিয়া ডাকাতি করিতে যায় না। হিন্দুর হিংস্রক পরের অবনতির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে। এত ধর্ম্মভয় ত অন্য জাতিতে দেখিতে পাই না। ইহার কি কোন কারণ নাই? আছে বই কি। হিন্দুর ধর্ম্মচর্চ্চা একদিন উন্নতির চরম সীমায় উঠিয়াছিল—হিন্দুর ধর্ম্ম এক দিন হিন্দুর রক্তমাংসে জড়িত হইয়াছিল, তাই পড়িতে পড়িতেও হিন্দুর ধর্ম্মভাব রহিয়া গিয়াছে। হিন্দুর ধর্ম্মভাব এখন দূষিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু সে ভাব এখনও বিদূরিত হয় নাই। এখনও হিন্দু পাপ-কার্য্য ধর্ম্মের ভাণে করে, এখনও হিন্দু-পাপী পাপাচরণেও ভগবান্‌কে ডাকে। এটি ভাল কি মন্দ—কে বলিবে! আর তাহা বলিবার স্থানও স্বতন্ত্র, লোকও স্বতন্ত্র, আমরা এখন এই মাত্র দেখাইব যে, পশুপতির এই ধর্ম্মের ভাণ বা আত্ম-প্রতারণের চেষ্টা, বড়ই স্বাভাবিক। স্নেহ বশে পশুপতিকে কবি এইরূপ চিন্তাদি-কারী করেন নাই—যাহা হইয়া থাকে, বাঙ্গালীর চরিত্রে যেরূপ দেখিয়া থাকি—রোহিণী-রূপ-প্রমত্ত রোহিণীভোগাকাঙ্ক্ষী গোবিন্দলালের অধঃপতনের পূর্ব্বে যাহা দেখিয়াছি, বিধবা কুন্দনন্দিনী-বিবাহেচ্ছু নগেন্দ্রনাথকে বিবাহের পূর্ব্বে যেরূপ দেখিয়াছি, এও সেইরূপই দেখিলাম। "পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া পুণ্যাত্মাও এইরূপ করে।" এইরূপ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সুমতি কুমতি, সংগ্রামে অনেক স্থলে প্রকৃত সুমতিও জয়লাভ করে না, প্রকৃত কুমতিও জয়লাভ করে না; জয়লাভ করে—সুমতিরূপা কুমতি।

"যদি ইহাতে পাপ হয়, যাবজ্জীবন প্রজার সুখানুষ্ঠান করিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।" এ কথাটিও হিন্দু পাপীর কথা। শত সহস্র হিন্দু পাপী আজ এইরূপ মনকে প্রবোধ দিয়া, পাপা-চরণ করিতে যাইতেছে। শিক্ষিতের প্রবোধ একরূপ, অশিক্ষিতের অন্যরূপ। অশিক্ষিত "গঙ্গাস্নানে পাপে যাইবে" স্থির করিয়া পাপাচরণ করে, শিক্ষিত ঐরূপ কোন একটা সুযুক্তি অবলম্বন করিয়া পাপানুষ্ঠানে রত হয়। হায়! কে কবে এই ভ্রান্তির রহস্য সমুদ্‌ঘাটিত করিবে? চুরি করিয়া টাকা আনিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিলে, কি অপহরণ দোষ লুপ্ত হয়? পশুপতি এইটি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি বুদ্ধিমান্‌, কিন্তু এখানে বড়ই ভুল বুঝিলেন।

এখন সব জড়াইয়া একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, দুরাশা-প্রেতিনী গর্ব্বিত স্বরে ঐখানে দাঁড়াইয়া বলিতে পারে কি না—

"সুন্দরকে মন্দ ভাবি, মন্দকে সুন্দর
বদ্ হাওয়া কুয়া দিয়া ফিরি নিরন্তর।"

মহম্মদ আলীর নিকটে যখন পশুপতি ঐরূপ ষড়যন্ত্রের কারণ ব্যাখ্যা করিলেন, তখন দেখিলাম, পশুপতি সমাজকেও বিলক্ষণ ভয় করিয়া চলেন। যেমন ধর্ম্মের জন্য একটা ব্যবস্থা করিতে হইল, সমাজের জন্যও তাঁহাকে সেইরূপ ব্যবস্থা করিতে হইল।

তৃতীয় ভাগ। সঙ্কল্পস্থির—কার্য্যারম্ভ—নূতন প্রতিবন্ধক (মনোরমা)—প্রতিবন্ধক তিরোহিত—কার্য্যের পরিণাম (অন্তঃপতন।)

পাপে পাপ বৃদ্ধি করে। একটি মিথ্যা কথায় দশটি মিথ্যা কথা কহায়। আমাদিগের কবি অন্যত্র লিখিয়াছেন—যেরূপ জড়জগতে মাধ্যাকর্ষণে প্রতি পদে পতনশীলের গতিবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ অন্তর্জগতে পাপাকর্ষণে প্রতি পাপে পাপীর পাপকামনা পরিবর্দ্ধিত হয়। সঙ্কল্প সম্যক্ সুস্থির হইতে না হইতেই, পশুপতি শরণাগত, উপচিকীর্ষু, অতিথি রাজকুমার, হেমচন্দ্রকে গোপনে হত্যা করিবার জন্য স্বীয় অনুচর শান্তশীলকে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন।

সঙ্কল্প সুস্থির হইলে, আবার এক নূতন প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হইল। সে প্রতিবন্ধক—মনোরমা।

আমরা এই স্থলে পশুপতি-মনোরমা সম্বন্ধীয় কয়েকটি কথা বলিয়া লইব।

পশুপতি মনোরমা সম্বাদ কবির আশ্চর্য্য কাব্যচাতুর্য্য প্রকাশিত করিতেছে। মনোরমা ফুটিয়াছে পশুপতির জন্য, আবার পশুপতিও খানিকটা ফুটিয়াছে মনোরমার জন্য। পশুপতি-মনোরমা উভয়ই ফুটিয়াছে, মনোরমার পূর্ব্বপরিচয় জন্য। পশুপতি-মনোরমার সেইরূপ বিবাহের পরিণাম, মনোরমার বিধবাবেশে অবস্থিতি ও বিধবাভাবে তৎপ্রতি পশুপতির আসক্তি, ইহাতেই সব ফুটিয়াছে। পশুপতির দুরদৃষ্ট, তাই পত্নী প্রতি তাঁহার আসক্তিতেও পাপফল প্রসব করিল। পাপটা মনে কি না—তাই।

মনোরমার প্রতি পশুপতির অনুরাগ কিরূপ প্রবল, কবি, তাহা স্বয়ং না বলিয়া একটি কৌশলে ব্যক্ত করিয়াছেন। যখন সব স্থির হইয়াছে, যখন পশুপতি ইষ্টদেবীকেও সান্ত্বনা করিয়াছেন ভাবিয়া, মনের সঙ্কল্প সুদৃঢ় করিয়াছেন, তখন পশুপতি শয্যাগৃহদ্বারে দেখিলেন—"অপূর্ব্বদর্শন—সম্মুখে দ্বারদেশ ব্যাপিত করিয়া, জীবনময়ী প্রতিমারূপিণী তরুণী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পশুপতি প্রথমে চমকিত হইলেন—শিহরিয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রবারিবৎ আনন্দে স্ফীত হইলেন।"

রমণি! ধন্য তোমাদের মহিমা! পশুপতির কি অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনই সাধিলে! একেবারে তাহাকে নরক হইতে স্বর্গে তুলিলে? কোথায় প্রভু-প্রতিপালক বৃদ্ধ রাজাকে রাজ্যচ্যুতের, শরণাগত অতিথির হত্যার মন্ত্রণা—আর কোথায় এ অপূর্ব্ব প্রেমোচ্ছ্বাস! মাত্রায় দুইই সমান—একটি সুকঠিন কঠোরতা—অন্যটি সুকো-

মল কোমলতা! পরিবর্তনকারিণী একটি রমণীমূর্ত্তি। রমণীগণ এ সংসারে যথার্থ ই দেবী।

এই উচ্ছ্বাসের সময় পশুপতির সহিত মনোরমার যেরূপ কথোপকথন হইল, তাহা সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। এখানে আমরা অন্য একটি কথা পাড়িব;

মনোরমা পশুপতিকে কহিতেছে—"তুমি আমায় ত্যাগ করিবে?"

"পশুপতি। কেন মনোরমে? তোমার জন্যই আমি এ মন্ত্রণা করিয়াছি। আমি এক্ষণে রাজভৃত্য, ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারি না। আমি বিধবা বিবাহ করিলে, জনসমাজে পরিত্যক্ত হইব; কিন্তু যখন আমি স্বয়ং রাজা হইব তখন কে আমায় ত্যাগ করিবে? যেমন বল্লাল সেন কৌলীন্যের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিয়াছিলেন, আমি সেইরূপ বিধবা-পরিণয়ের নূতন পদ্ধতি প্রচলিত করিব।"

এ কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলে, আমরা দেখিতে পাই, একমাত্র মনোরমা-প্রাপ্তিই পশুপতির রাজ্যাকাঙ্ক্ষার কারণ। কারণটি সাধারণ নহে, স্বীকার করিতে হইবে। এ জগতে রমণীপ্রণয় না করিতে পারে, এমন কার্য্যই নাই। লোককে স্বর্গেও তুলিতে পারে, নরকেও ডুবাইতে পারে! পশুপতির এই কথাটি দ্বারা যেমন এক দিকে তাহার প্রণয়-বলটি সূচিত হইয়াছে, অন্য দিকে তেমন প্রণয়ের স্বকীয় মাহাত্ম্যও প্রকটিত হইয়াছে!

কিন্তু আমরা ইহা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। মনোরমা প্রাপ্তি আশা যে রাজ্যাকাঙ্ক্ষার একমাত্র কারণ, তাহা আমরা বলিতে প্রস্তুত নহি। পশুপতি যখন স্বীয় ইষ্টদেবীর নিকটে মনোবাসনা ব্যক্ত করিতেছেন, তখন এ কথা প্রকাশিত নাই কেন? তোমরা বলিবে—মনোরমার জন্যই ত রাজ্যাকাঙ্ক্ষা—সেই রাজ্যাকাঙ্ক্ষার জন্য যখন পশুপতি ঐরূপ বলিয়াছেন, তখন আবার পৃথক করিয়া সে রাজ্যাকাঙ্ক্ষার কারণ না বলিলেও ত চলিতে পারে। তাহা পারে না। মনোরমার জন্য রাজ্যাকাঙ্ক্ষা হইলে, সে কথাটা তখন একবারও মুখে না আনা সম্ভবপর নহে। ফলকথা—রাজ্যাকাঙ্ক্ষা, রাজ্য ও মনোরমা উভয়েরই জন্য। দুইই একত্র মনে উদিত হয়, তাই পশুপতি দুইটিকে সম্যক মিশাইয়া এক স্থলে রাজ্য ও এক স্থলে মনোরমাকে প্রাধান্য দিতেছেন। প্রণয়পাত্রের নিকট অজ্ঞাত কপটতা জগৎ-প্রসিদ্ধ। এই দুই ভাব যে পর্য্যন্ত মিশিয়া রহিল, সে পর্য্যন্ত ইহার কোন্‌টি প্রধান বুঝা গেল না। কিন্তু কবি ছাড়িবার পাত্র নহেন—কথাটি আরও খুলিলেন। যখন মনোরমা পশুপতিকে প্রারব্ধ কার্য্যে বাধা দিতে লাগিল, অনেক প্রকারে বুঝাইয়া বলিল,—"পশুপতি, আমি মিনতি করিতেছি, এই দুর্ব্বুদ্ধি ত্যাগ কর"—কবি কহিতেছেন—

"পশুপতি পূর্ব্ববৎ অধোবদনে রহিলেন, তাঁহার রাজ্যাকাঙ্ক্ষা এবং মনোরমাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা উভয়ই গুরুতর। কিন্তু রাজ্যলাভের যত্ন করিলে, মনোরমার প্রণয় হারাইতে হয়, সেও অত্যাজ্য। উভয় সঙ্কটে তাঁহার চিত্তমধ্যে গুরুতর চাঞ্চল্য জন্মিল। তাঁহার মতির স্থিরতা দূর হইতে লাগিল। 'যদি মনোরমাকে পাই, ভিক্ষাও ভাল, রাজ্যে কাজ